লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

# আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৭ বর্ষ | ২২তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ | ১৩ শাবান, ১৪৩৬ হিজরি | ৩১ হিজরত, ১৩৯৪ হি. শা. | ৩১ মে, ২০১৫ ঈসাব্দ

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে
Love for All
Hatred for None

## খেলাফত, শান্তি ও ন্যায়বিচার

বিস্তারিত ভিতরের পাতায়

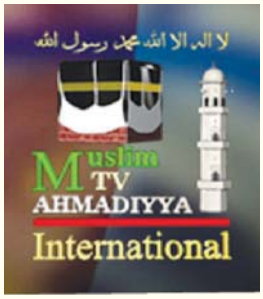

INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

## এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

## এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময় সূচি

১। শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং রাত ৩.০০।

২। শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

৩। রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

৩। বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

**এছাড়া বাংলাদেশের অনুষ্ঠান দেখুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন রাত ৮.০০-৯.০০ পর্যন্ত।**

## শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী উপলক্ষে বহু প্রতিক্ষিত শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে।

এটি ইতিহাস ও তথ্যের এক অতুলনীয় সন্নিবেশ। এতে হুযূর আকদাস (আই.)-এর শতবার্ষিকী উপলক্ষে ঐতিহাসিক ভাষণ এবং স্মরণিকার জন্য হুযূর আকদাসের বিশেষ বাণী রয়েছে।

এতে আরো রয়েছে, এই বাংলা এবং পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি থেকে পথচলার দুর্লভ ইতিহাস। রয়েছে বাংলাদেশের সকল মসজিদ ও মিশনের সচিত্র একটি সংগ্রহ। এছাড়াও এতে এমন কিছু তথ্য রয়েছে যা ইতিপূর্বে কখনও সামনে আসে নি। এতে রয়েছে, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এছাড়াও রয়েছে ঈমান উদ্দীপক ও ইতিহাস সম্বলিত অনেক প্রবন্ধ। দু'শত বত্রিশ পৃষ্ঠার এই স্মরণিকায় আরো এমন বিষয় রয়েছে যা সত্যিই সংগ্রহ করে রাখার মত। তাই যত শিঘ্র সম্ভব আপনার কপিটি বাংলাদেশের ইশায়াত বিভাগে যোগাযোগ করে সংগ্রহ করুন।

স্মরণিকাটির শুভেচ্ছা মূল্য ৩০০/- (তিন শত) টাকা। প্রয়োজনে : ০১৭৩৬ ১২৪৭০৪


"Love For All, Hatred For None."

**Hakim Watertechnology**

"Best Water, Best Life"

House hold/Official — Commercial/Industrial — Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

# সম্পাদকীয়

## আহমদীয়া খেলাফতের জয়যাত্রা এগিয়ে চলছে বিশ্ব-শান্তির তরী

কাল-পরিক্রমায় আরেকটি বছর আমরা পার হলাম। ২৭ মে ২০১৫ আহমদীয়া খেলাফত ১০৭ বছর পেরোচ্ছে। বিগত এক বছরে আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মহান খলীফার নেতৃত্বে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে অনেক বড় বড় সফলতা অর্জন করেছে, আলহামদুল্লিাহ! নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) গত কয়েক বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে যেমন ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা এবং ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন তেমনি তিনি বর্তমান বিশ্বের ক্ষমতাধর রাষ্ট্র আমেরিকার কংগ্রেস ভবনেও ইসলামের সমতা ও ন্যায়-ভিত্তিক আকর্ষনী শিক্ষা তুলে ধরেছেন যার প্রয়োগে বিশ্ব-শান্তি সুনিশ্চিত হতে পারে।

**'সব সময় মনে রাখবেন, কায়েমী স্বার্থ থেকে মুক্ত হয়ে এবং সকল প্রকার শত্রুতার উর্ধ্বে থেকে অত্যাচারিত এবং অত্যাচারী, উভয়কে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষভাবে সাহায্য করা হলেই কেবলমাত্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সংশ্লিষ্ট সকলকে সমান প্লাটফর্ম ও সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে শান্তি আসে।'**

একইভাবে ব্রাসেল্‌সের ইউরোপীয় পার্লামেন্টে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে অসাধারণ বক্তৃতা দিয়েছেন। ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের দাঁতভাঙ্গা জবাবও তিনি তাঁর জুমুআর খুতবার মাধ্যমে প্রতি শুক্রবার দিয়ে যাচ্ছেন। গত এক বছরে ইসলামের পক্ষে এ জামাত থেকে প্রকাশিত হয়েছে অগনিত বই-পুস্তক। লাখ লাখ পথ হারা মানুষের কাছে শান্তির ধর্ম ইসলামের মনোমুগ্ধকর শিক্ষা পৌঁছানো হয়েছে। আর্তমানবতার সেবায় পশ্চাদপদ বিভিন্ন দেশে সেবা প্রদান করা হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল। এক খোদার বাণী উচ্চকিত করে ইবাদত করতে আর সেই সত্য প্রচার করার জন্য নির্মিত হয়েছে বহু মসজিদ।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) আমেরিকার শক্তিধর নীতিনির্ধারকদেরকে শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় সংক্রান্ত যে দিক-নির্দেশ করেছেন, তাতে তিনি একথা বলেছেন যে, 'একথা সর্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক, মানবীয় জ্ঞান ও মেধা ত্রুটিমুক্ত নয়, বরং এর অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই সিদ্ধান্ত নেয়ার বা চিন্তা-ভাবনার রূপরেখা নির্ধারণের সময়, প্রায়শঃই নির্দিষ্ট কিছু বিষয় মানব হৃদয়ে অনুপ্রবেশ করে বিচার ক্ষমতাকে কলুষিত করে দিতে পারে এবং এর পরিণতিতে মানুষ তার ব্যক্তি-স্বার্থ চরিতার্থ করার কাজে লিপ্ত হতে পারে। চূড়ান্ত পর্যায়ে এটি অন্যায় ফলাফল প্রকাশ ও অন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে পর্যবসিত হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্‌র আইন নিখুঁত, হীন স্বার্থসিদ্ধি বা অন্যায্য উপকরণের রেশমাত্র এতে নেই। এর কারণ হলো, আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির জন্য কেবল ভাল বা মঙ্গলই কামনা করে থাকেন আর তাই তাঁর আইন হলো সম্পূর্ণভাবে ন্যায্য আর ন্যায়নীতির সামগ্রিকতায় পরিপূর্ণ। পৃথিবীর মানুষ যেদিন এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি অনুধাবন করতে সক্ষম হবে, সেদিন প্রকৃত ও স্থায়ী শান্তির ভিত রচিত হবে। অন্যথায় বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এগুলো কোন কার্যকর ফলাফল বয়ে আনতে পারছে না বলেই প্রতীয়মান হয়।'

এছাড়া তিনি (আই.) ইউরোপীয় পার্লামেন্টে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই আহ্বানই করেন, 'সব সময় মনে রাখবেন, কায়েমী স্বার্থ থেকে মুক্ত হয়ে এবং সকল প্রকার শত্রুতার উর্ধ্বে থেকে অত্যাচারিত এবং অত্যাচারী, উভয়কে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষভাবে সাহায্য করা হলেই কেবলমাত্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সংশ্লিষ্ট সকলকে সমান প্লাটফর্ম ও সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে শান্তি আসে।'

হুযূর (আই.)-এর উপরোক্ত কালোত্তীর্ণ দিকদর্শী নির্দেশনার আলোকে রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা দেশ পরিচালনা করলে বিশ্ব অনাবিল শান্তির পরশে সিক্ত হবে। মহান খোদা তা'লা আমাদের সবাইকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সবার মাঝে পৌঁছে দেয়ার তৌফিক দান করুন, আমীন।

# সূচিপত্র

৩১ মে, ২০১৫


| | |
|---|---|
| **কুরআন শরীফ** | ৩ |
| **হাদীস শরীফ** | ৪ |
| **অমৃত বাণী** | ৫ |
| হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ১৭ এপ্রিল, ২০১৫-এর **জুমুআর খুতবা।** | ৬ |
| **খেলাফত, শান্তি ও ন্যায়বিচার** | ১৩ |
| **কলমের জিহাদ**<br>মুহাম্মদ খলিলুর রহমান | ২০ |
| **ইহজগতে জান্নাতের প্রতিচ্ছবি নেযামে ওসিয়্যত ও খেলাফত**<br>মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্ | ২৩ |
| **শবে বরাত ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে আদৌ কোন গুরুত্ব রাখে কী?**<br>আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ | ২৫ |
| **হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)-এর কর্মময় জীবনের কিছু দিক**<br>ভাষান্তর: মহিউদ্দিন আহমদ | ২৮ |
| **"বিভিন্ন ধর্মের আলোকে ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন ও তাঁর সত্যতা"**<br>মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন | ৩৩ |
| হযরত মৌলভী হেকীম নূরুদ্দীন (রা.)-এর নামে দ্বিতীয় বিয়ে প্রসঙ্গে **হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর লেখা পত্র** | ৩৬ |
| **আমাদের কৃতকর্মের জন্যই আসে ঐশী আজাব**<br>মাহমুদ আহমদ সুমন | ৩৭ |
| **মরহুমা মাহমুদা বেগম সাহেবার স্মৃতিকথা**<br>নিলুফার মমতাজ | ৩৯ |
| **সংবাদ** | ৪১ |
| **আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ** | ৪৬ |
| **হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক তাহরীককৃত দোয়াসমূহ** | ৪৮ |



**'পাক্ষিক আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।

পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন **'পাক্ষিক আহমদী'**র সাথেই থাকুন।

ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'পাক্ষিক আহমদী'** পড়তে **Log in** করুন

**www.ahmadiyyabangla.org**

**অনুগ্রহ পূর্বক ভিজিট করুন আমাদের সত্যের সন্ধানের ইউটিউব চ্যানেল:**

www.youtub.com/shottershondhane

**Please visit it**

# কুরআন শরীফ

## সূরা আল হিজ্‌র-১৫

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ
أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٩﴾

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٩٠﴾

كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩١﴾

৮৯। আমরা তাদের কোন কোন শ্রেণীকে যেসব সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য দান করেছি তুমি সেগুলোর দিকে (কামনার) দৃষ্টি প্রসারিত করো না। আর তাদের জন্য দুশ্চিন্তা করো না[১৫২৩]। আর মু'মিনদের জন্য তোমার (করুণার) ডানা মেলে দাও।

৯০। আর তুমি বল, 'আমি নিশ্চয় এক প্রকাশ্য সতর্ককারী'।

*৯১। আমরা তাদের ওপর যথারীতি শাস্তি অবতীর্ণ করবো, যারা দলে উপদলে বিভক্ত[১৫২৪] হবে।

---

১৫২৩। এই আয়াতের প্রকৃত মর্ম হচ্ছে ঃ নবী করীম (সা.) যাতে দুঃখিত না হন তজ্জন্য বলা হয়েছে যে, কাফেরদের শাস্তি অত্যাসন্ন এবং তাদের সকল ধন-সম্পদ, উন্নতি ও গৌরব, যে সবের কারণে তারা এত অহঙ্কারী হয়ে উঠেছে তা তাদের কোনই উপকারে আসবে না।

১৫২৪। মক্কার কাফেররা তাদের বিভিন্ন দল গঠন করে তাদের ওপর বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করলো যাতে তারা নবী করীম (সা.)-এর কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। অথবা উক্ত ভিন্ন ভিন্ন দল নিজেরা নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করলো এবং তারা তাঁকে (মহানবী সা.কে) হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলো। মুক্‌তাসেমীন এর অর্থ এও হয় যে তারা একে অন্যের প্রতি বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করলো।

# হাদীস শরীফ

# গভীর ও সুনিবিড়-বন্ধনে খিলাফতের সাথে আঁকড়ে থাকার তাগিদপূর্ণ নির্দেশ

হযরত উক্‌বা বিন আমের (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) নিজের চাচা হযরত আব্বাস (রা.)-এর হাত ধরে বললেন–"কোন নবুওয়াত যখনই এসেছে, এরপর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।" (মাজমাউল জওয়াইদ খণ্ড-৫, পৃ: ১১৮)

হযরত আব্দুর রহমান বিন সাহল (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন–"প্রত্যেক নবুওয়াতের পর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।" (কানযুলুল উম্মাল, কিতাবুল ফিতন মিন কিসামিল আফআল ফাযলু ফি মুতাফাররিকাতুল ফিতন, খণ্ড-১১, পৃ: ১১৫)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (সা.) বলেছেন–"বনী ইসরাঈল জাতির তত্ত্বাবধান করতেন নবীগণ। যখন কোন নবীর মৃত্যু হতো, তখন অন্য এক নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর দেখ! আমার অব্যবহিত পরে কোন নবী নাই। কিন্তু খলীফা অবশ্যই হবেন। আর অনেক হবেন।" (সহী বুখারী, কিতাব-আহাদীসে আম্বিয়া, বাবু মা যাকারা আন বানী ইসরাঈল)

হযরত সাফিনা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (সা.) বলেছেন–"আমার উম্মতে ৩০ বছর খিলাফত থাকবে। এরপর রাজতন্ত্র শুরু হবে" (জামে তিরমিযী, কিতাবুল ফিতন, বাবুল খিলাফাত)।

হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (সা.) বলেছেন–"তোমাদের মধ্যে নবুওয়াত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এরপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এরপর অত্যাচার ও উৎপীড়নের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা পাবে। এরপর জবরদস্তিমূলক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এরপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে (পুণরায়) খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এরপর রসূল (সা.) নীরব হয়ে গেলেন।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) হযরত উসমান (রা.)-এর বিষয়ে বলেন–"নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে একটি পোশাক পড়াবেন। মুনাফিকরা যদি তোমার এ পোশাক খোলার চেষ্টা করে, তবুও তুমি এটা কখনও খুলবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি আমার সাথে এসে মিলিত হও। এ কথা রসূল (সা.) তিন বার বললেন।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)

হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (সা.) বলেছেন–"ইমাম হলেন ঢাল, যার নেতৃত্বে ও আনুগত্যে থেকে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা যায়, আর শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচাও যায়" (সহী বুখারী, কিতাবুল জিহাদ)।

হযরত আকরাম বিন সারিয়া (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন–"তোমাদের জন্য আমার সুন্নত ও খুলাফায়ে রাশেদীন, যারা খোদার পক্ষ থেকে হেদায়াত প্রাপ্ত, তাদের সুন্নতের অনুসরণ করা ফরয। এই রাস্তাকে দৃঢ়তার সাথে ধরো এবং দাঁত দিয়ে ভাল করে আঁকড়ে রাখ।" (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুস্ সুন্নাত)

হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন–"যদি তোমরা দেখ, আল্লাহ্‌র খলীফা ভূ-পৃষ্ঠে বিদ্যমান রয়েছেন, তা'হলে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাও, যদিও (এ অপরাধে) দেহ ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়া হয় আর তোমাদের ধন-সম্পদ লুট করে নেয়া হয়" (মুসনাদ আহমদ, হাদীস নম্বর ২২৩৩৩)।

হযরত উরফাযা (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন–"যখন তোমরা এক হাতে একত্রিত হও, আর তোমাদের এক আমীর হয়, তখন যদি কোন ব্যক্তি তোমাদের একতাকে ভঙ্গ করতে চায়, এমনকি তোমাদের জামা'তে কোন মতভেদ সৃষ্টি করে, তাহলে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নাও, তার কথা শুনবে না" (সহী মুসলিম, কিতাবুল ইমারাতে, বাব-হুকমুন মিন ফাউক)।

# অমৃতবাণী

# আমি খোদা তা'লার এক মূর্তিমান কুদরত আমার পরে আরও কতিপয় ব্যক্তি দ্বিতীয় কুদরতের প্রকাশস্থল হবেন

## হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

খলীফা স্থলাভিষিক্তকে বলে। আর রসূলের স্থলাভিষিক্ত সত্যিকার অর্থে তিনিই হতে পারেন যিনি প্রতিচ্ছায়ারূপে রসূলের গুণাবলী নিজের মাঝে রাখেন। এ জন্য রসূল করীম (সা.) চাননি অত্যাচারী বাদশাহদের জন্য খলীফা শব্দ ব্যবহৃত হোক। কেননা বাস্তবিক অর্থে খলীফা রসূলের প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকেন। যেহেতু কোন মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে না সেহেতু খোদা তাআলা সংকল্প করে নিয়েছেন–রসূলের সত্ত্বা যা জগতের অপরাপর সকল সত্ত্বা থেকে সম্মানিত ও সর্বোত্তম সেটাকে যেন প্রতিচ্ছায়া আকারে কিয়ামতকাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রাখেন। সুতরাং এই উদ্দেশ্যেই খোদা তাআলা খিলাফত ব্যবস্থাকে বেছে নিয়েছেন যাতে জগত কখনও কোন যুগে নবুওয়তের বরকত থেকে বঞ্চিত না থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি খিলাফতকে শুধু মাত্র ত্রিশ বছর পর্যন্ত মানে সে নিজের নির্বুদ্ধিতার কারণে খিলাফতের মূল উদ্দেশ্যকেই উপেক্ষা করে যায়। আর জানে না এটা কখনও খোদা তাআলার ইচ্ছা ছিল না–রসূল করীম (সা.) এর মৃত্যুর পর মাত্র ত্রিশ বছর পর্যন্ত নবুওয়তের বরকতকে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। এরপর এ জগৎ ধ্বংস হয়ে যাক এতে কিছু যায় আসে না!

.....সুতরাং খোদা তাআলার ব্যাপারে এমনটা মনে করা একটা হীন চিন্তাধারা–তাঁর শুধুমাত্র .....ত্রিশ বছরের চিন্তা ছিল। পরে সর্বদার জন্য পথভ্রষ্টতায় ছেড়ে দিয়েছেন। আর ঐ নূর যা প্রাচীন কাল থেকে পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতের মধ্যে খিলাফতের আয়নায় পরিদৃষ্ট হতো, এদের জন্য তা দেখানোর অনুমতি নেই! সুস্থ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন কোন ব্যক্তি কি দয়ালু ও অনুগ্রহশীল খোদার জন্য এ বিষয়টি মেনে নিতে পারে? কখনও না। আর এ আয়াত ইমামদের খিলাফতের বিষয়ে সাক্ষ্যদানকারী। ...কেননা এ আয়াত সুস্পষ্টভাবে বলছে ...খিলাফত চিরস্থায়ী। এজন্য ***'ইয়ারিমুহা'*** শব্দ স্থায়ীত্বকে চায়। কারণ হলো, যদি শেষ সুযোগ দুষ্কৃতকারীরা পেয়ে যায় তাহলে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী তারাই হয়ে যাবে – সৎকর্মশীলরা হবে না। সবার উত্তরাধিকারী তারাই হয় যারা সবার পরে আসে। (শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৩-৫৪)

"যখন আমরা কুরআনের প্রতি দৃষ্টি দেই। আর গভীর দৃষ্টিতে তা দেখি। তখন এটা উচ্চ স্বরে এই বলতে থাকে–আধ্যাত্মিক শিক্ষক সর্বদা বিদ্যমান থাকবে এটাই এর মূল অভিপ্রায়।....এছাড়া আরও কতিপয় আয়াত আছে যা থেকে প্রমাণ হয়, খোদা তা'লা অবশ্যই এ ইচ্ছা পোষণ করেছেন, আধ্যাত্মিক শিক্ষক যারা নবীদের উত্তরাধিকারী তারা যেন সর্বদা হতে থাকেন। আর তা এই (সূরা নূর-৫৬) অর্থাৎ খোদা তা'লা তোমাদের জন্য ওয়াদা করেছেন –তিনি তোমাদেরকেও পৃথিবীতে খলীফা বানাবেন, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের করেছেন।.....এই আয়াতকে যদি কোন ব্যক্তি গুরুত্বের সাথে ও গভীরভাবে দেখে, তাহলে আমি কিভাবে বলব–এ লোক এ বিষয়কে বুঝবে না যে, খোদা তা'লা চিরস্থায়ী খিলাফতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যদি খিলাফত চিরস্থায়ী না হতো তাহলে মূসায়ী শরীয়তের খিলাফতের সাদৃশ্য বর্ণনার মাহাত্ম্য কি? আর খিলাফতে রাশেদা তিরিশ বছর থাকার পর সর্বদার জন্য যদি বিলুপ্তি ঘটে, তাহলে এটা থেকে ফলাফল দাঁড়ায় যে, খোদা তা'লার কখনও এ ইচ্ছা ছিল না, এ উম্মতের জন্য সর্বদা সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত থাকুক। আর মূলত: আধ্যাত্মিকতার মৃত্যুতে ধর্মের মৃত্যুও অনিবার্য হয়ে পড়ে।"

(শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৩৫১-৫৩)

# জুমুআর খুতবা

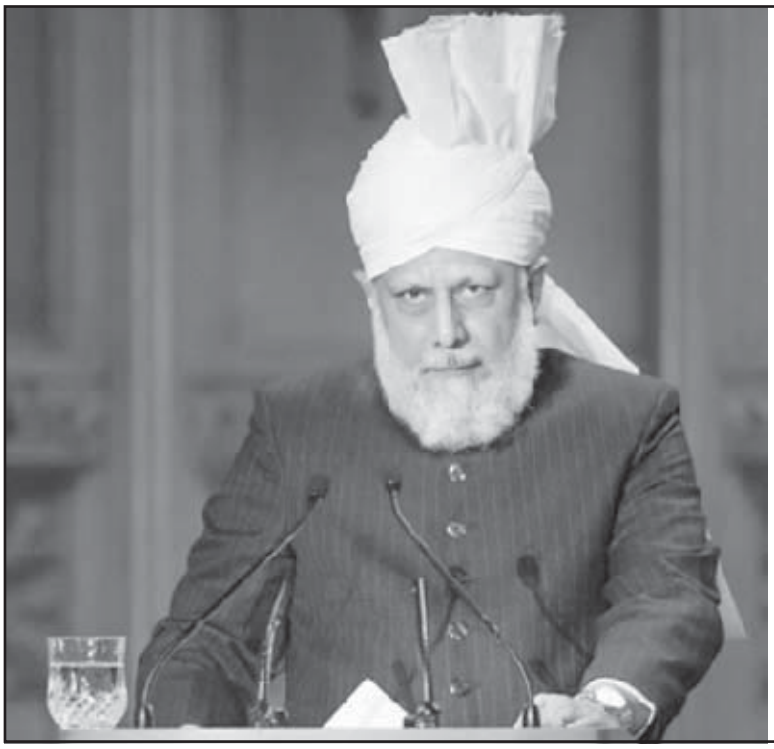

## খোদার প্রেরিতদের সম্মোহন ও আকর্ষণী শক্তি

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১৭ এপ্রিল, ২০১৫-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۞ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

দোয়ার মাধ্যমে যে কীভাবে বড় বড় কাজ সাধন করা সম্ভব সেই প্রেক্ষাপটে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) একবার দোয়ার গুরুত্ব বর্ণনা করছিলেন। এর বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি মেসমেরিজম বা সম্মোহন বিদ্যা সম্পর্কেও আলোকপাত করেন, যারা সম্মোহন বিদ্যায় পারদর্শী হয় তারাও জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের চিন্তা ধারায় কিছু পরিবর্তন এনে থাকে। কিন্তু সেটি সাময়িক এবং ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে আর তা এমনও নয় যারফলে কোন বৈপ্লবিক কল্যাণ সাধিত হতে পারে। পক্ষান্তরে দোয়া যদি সঠিকভাবে করা হয় তাহলে তা একটি জাতির ভাগ্য বদলে দিতে পারে। যাহোক, এর বিশদ আলোচনা করতে গিয়ে তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যা হযরত সূফী আহমদ জান সাহেবের সাথে সম্পর্কযুক্ত। হযরত সূফী আহমদ জান সাহেব সম্পর্কে আমি তিন জুমুআ পূর্বেও বলেছিলাম, কীভাবে তিনি একজন পীরের সাহচর্যে থেকে বা অবস্থান করে সংগ্রাম-সাধনা করেছিলেন আর পরবর্তীতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতিও তার হৃদয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা জন্মে। তাঁর দাবীর পূর্বেই তিনি তাঁর পদমর্যাদা কী হবে তা শনাক্ত করতে পেরেছিলেন। যাহোক, এখন আমি হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর ভাষায় এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরছি যদ্বারা এটি বুঝা যায়, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্মোহন বিদ্যা বা মেসমেরিজমের মাধ্যমে অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তারকে কিরূপ দৃষ্টিতে দেখতেন।

মেসমেরিজম বা সম্মোহন বিদ্যা কী? হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, তা শুধুমাত্র কয়েকটি খেলা বা ক্রীড়া-কৌতুকেরই নাম কিন্তু দোয়া সেই অস্ত্রের নাম যা আকাশ এবং পৃথিবীকে বদলে দেয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তখনও দাবী করেন নি, শুধু 'বারাহীনে আহমদীয়া' লিখেছিলেন। সূফী এবং আলেমদের মাঝে এর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। পীর মঞ্জুর মোহাম্মদ সাহেব এবং পীর ইফতেখার আহমদ সাহেবের পিতা সূফী আহমদ জান সাহেব সেই যুগে অসাধারণভাবে খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিজ্ঞাপন পাঠের পর তিনি তাঁর সাথে পত্রালাপ আরম্ভ করেন আর এই বাসনা ব্যক্ত করেন, যদি কখনো লুধিয়ানা আসেন তাহলে আসার পূর্বেই আমাকে সংবাদ দিবেন।

কাকতালীয়ভাবে সেই দিনগুলোতেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লুধিয়ানা যাওয়ার সুযোগ হয়। সূফী আহমদ জান সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে আমন্ত্রণ জানান। নিমন্ত্রণের পর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তার ঘর থেকে ফিরে আসার সময় সূফী আহমদ জান সাহেবও সাথে যাত্রা করেন। সূফী আহমদ জান সাহেব রতর-সতরের পীরের মুরীদ ছিলেন। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও অর্থাৎ যে যুগের কথা তিনি (রা.) বলছেন এর কিছুদিন পূর্বেও রতর-সতরের সূফী ভারতের সূফীদের মাঝে অনেক বড় মর্যাদা রাখত এবং পুরো এলাকায় প্রসিদ্ধ ছিল। তপস্যা এবং তাক্বওয়া ছাড়াও মেসমেরিজম বা সম্মোহন বিদ্যায় সেই পীর সাহেব এতটাই দক্ষ ছিলেন, তিনি যখন নামায পড়তেন তখন তার ডানে-বামে অনেক মুরীদ বা ভক্ত সারিবদ্ধভাবে বসে থাকতো। আর নামাযের পর তিনি যখন সালাম ফিরাতেন তখন সালামের সাথে তিনি ডানে-বামে ফুঁকও দিতেন এবং এর প্রভাবও ছিল কেননা মেসমেরিজম বা সম্মোহন বিদ্যার প্রবল প্রভাব ছিল একইসাথে রোগীরা আরোগ্যও লাভ করত। যেভাবে গত খুতবায় আমি এর বরাতে কথা বলেছিলাম, পীর সাহেব অর্থাৎ সূফী আহমদ জান সাহেব বারো বছর পর্যন্ত তার শিষ্যত্বে কাটিয়েছেন আর সেই পীর সাহেব তার দ্বারা চাক্কি বা যাতা পেষাতেন। যাহোক, রাস্তায় সূফী আহমদ জান সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে নিবেদন করেন, আমি এত বছর রতর-সতরের পীরের খিদমত করেছি। এরপর সেখান থেকে আমার এত শক্তি লাভ হয়েছে যে, দেখুন! আমার পিছনে যে ব্যক্তি আসছে, যদি আমি মনোসংযোগ করে তার ওপর দৃষ্টিপাত করি তাহলে সে এখনই মাটিতে পড়ে ছটফট করবে। অর্থাৎ সম্মোহন শক্তির মাধ্যমে এমন হবে। একথা শুনতেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দাঁড়িয়ে যান এবং তাঁর ছড়ির প্রান্ত দ্বারা মাটিতে রেখা অঙ্কন করতে করতে বলেন, হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অভ্যাস ছিল তাঁর ভেতর যখন কোন বিশেষ আবেগ বা উত্তেজনা বিরাজ করত তখন তিনি ধীরে ধীরে নিজের ছড়ির প্রান্ত সেভাবে মাটিতে ঘষতেন যেভাবে মাটি খুঁড়ে কোন কিছু বের করা হয়। যাহোক, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দাঁড়িয়ে যান আর নিজের ছড়ির ডগা দ্বারা ধীরে ধীরে মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করেন এবং বলেন, সূফী সাহেব! এই ব্যক্তি ভূপাতিত হলে আপনারই বা কী লাভ হবে আর তারই বা কী লাভ হবে? সূফী সাহেব যেহেতু সত্যিকার অর্থেই খোদাপ্রেমিক মানুষ ছিলেন আর খোদা তা'লা তাকে দূরদর্শী দৃষ্টি দিয়ে রেখেছিলেন তাই এ কথা শুনতেই তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মত হয়ে যান এবং বলেন, আমি আজ থেকে এই জ্ঞান চর্চা করা হতে তওবা করছি বা বিরত হচ্ছি। আমি বুঝতে পেরেছি, এটি জাগতিক বিষয়, ধর্মীয় কোন বিষয় নয়। অতএব এরপর তিনি এ তথ্য সম্পর্কিত একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করেন, এই জ্ঞান কেবল ইসলামেরই বিশেষত্ব নয়। কোন হিন্দু এবং খ্রিষ্টানও যদি এ ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করতে চায় তাহলে তা করতে পারে। তাই আমি ঘোষণা করছি, আজ থেকে আমার কোন ভক্ত বা শিষ্য একে ইসলামের অঙ্গ বা অংশ মনে করে যেন এর চর্চা না করে। হ্যাঁ জাগতিক জ্ঞান হিসেবে যদি চর্চা করতে চায় তাহলে করতে পারে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এই যে আমি বললাম, খোদা তা'লা তাকে দূরদর্শী দৃষ্টি দিয়ে রেখেছিলেন আমাদের কাছে এর এক আশ্চর্যজনক প্রমাণ রয়েছে আর তাহলো, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তখন পর্যন্ত কেবলমাত্র 'বারাহীনে আহমদীয়া'ই প্রণয়ন করেছিলন আর তিনি অর্থাৎ সূফী সাহেব বুঝতে পেরেছিলেন, এই ব্যক্তি মসীহ্ মাওউদ হতে যাচ্ছেন অথচ তখনও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছেও এটি স্পষ্ট হয়নি যে, তিনি কোন দাবী করতে যাচ্ছেন। সে যুগেই তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে উদ্দেশ্য করে এক পত্রে এই পঙতি লিখেছেন আর যে পঙতির কথা আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি, তিনি লিখেছেন, "হাম মারিযো কি হ্যায় তুম হি পে নিগাহ্, তুম মসীহা বানো খোদাকে লিয়ে" অর্থ- আমরা যুগের ব্যধিগ্রস্ত লোকদের তোমার সত্তায় দৃষ্টি নিবদ্ধ, তুমি খোদার খাতিরে যুগের চিকিৎসক হিসেবে আবির্ভূত হও। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এটি থেকে বুঝা যায়, তিনি দিব্যদর্শনের অভিজ্ঞতা রাখতেন আর আল্লাহ্ তা'লা তাকে অবহিত করেছিলেন, এ ব্যক্তি মসীহ্ মাওউদ হতে যাচ্ছেন। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবীর পূর্বেই ইন্তেকাল করেন কিন্তু তিনি নিজ সন্তান-সন্ততিকে এই তাকীদপূর্ণ নির্দেশ দিয়ে যান, হযরত মির্যা সাহেব দাবী করবেন, তাঁকে মানতে গিয়ে কালক্ষেপণ করবে না। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) লিখেছেন, তার আরো একটি পরিচয় হলো, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-র বিয়েও তার ঘরেই হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) তার জামাতা ছিলেন।

এরপর মেসমেরিজম বা সম্মোহন বিদ্যা সংক্রান্ত একটি ঘটনা যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বৈঠকে ঘটেছে তা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তাঁর প্রেরিত মহাপুরুষের ওপর যে মেসমেরিজম করেছে তাকে শুধু ব্যর্থই করেন নি বরং নিদর্শন দেখিয়েছেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, মেসমেরিজম বিদ্যায় পারদর্শীদের সংকল্প শক্তি ঈমানী শক্তির মোকাবিলায় কী-ই বা গুরুত্ব রাখে? সম্মোহন বিদ্যায় বিশেষজ্ঞদের সংকল্প শক্তি ঈমানের শক্তির মোকাবেলায় দাঁড়াতেই পারে না। খোদা প্রদত্ত সংকল্প শক্তি এবং মানুষের সংকল্প শক্তির মাঝে আকাশ পাতালের পার্থক্য রয়েছে। যেই মসজিদে তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন সেটি মসজিদে আক্বসা বা মোবারক হবে। খলীফা সানী (রা.) বলেন, এই মসজিদেরই নিচের ছাদে (হুযূর বলছেন, খুব সম্ভব মসজিদে মোবারকই হবে) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মজলিসে বা বৈঠকে বসতেন। একবার তিনি (আ.) মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন এক হিন্দু যে কিনা লাহোরের কোন এক বিভাগে হিসাব রক্ষক ছিল, (হুযূর বলছেন), এটি নিশ্চিতভাবে মসজিদে মোবারকেরই ঘটনা, এবং মেসমেরিজমে অনেক দক্ষ ছিল। সে কোন বরযাত্রীদের সাথে এই উদ্দেশ্য নিয়ে কাদিয়ান আসে যে, আমি মির্যা সাহেবের ওপর সম্মোহন শক্তি প্রয়োগ করব আর তিনি মজলিসে বা বৈঠকে বসে নাচতে বা নৃত্য করতে আরম্ভ করবেন (নাউযুবিল্লাহ্) আর এভাবে মানুষের মাঝে তিনি হেয় প্রমাণিত হবেন। এই ঘটনা সেই হিন্দু স্বয়ং এক আহমদী বন্ধুকে শুনিয়েছে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হলো, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লাহোরের সেই আহমদীর হাতে তাঁর একটি বই পাঠান এবং বলেন, এই গ্রন্থ অমুক হিন্দুর হাতে হস্তান্তর করবে। সেই আহমদী বন্ধু সে বইটি সেই হিন্দুর হাতে হস্তান্তর করেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন, হযরত সাহেব আপনাকে তাঁর বই কেন পাঠালেন আর তাঁর সাথে আপনার সম্পর্কই বা কী? তখন সেই হিন্দু তার পুরো ঘটনা শোনায়। সে বলে, সম্মোহন বিদ্যায় আমি এত দক্ষতা রাখি যে, আমি যদি টমটম বা ঘোড়ার গড়িতে বসে কোন ব্যক্তির ওপর

মনোসংযোগ করি তাহলে সেও টমটম গাড়ির পিছনে ছুটে আসবে অথচ তার সাথে আমার পরিচয় বা জানাশোনাও থাকবে না। সে বলে, আমি আর্য এবং হিন্দুদের কাছে মির্যা সাহেবের কথা শুনেছি যে, তিনি আর্য ধর্মের বিরুদ্ধে অনেক বই-পুস্তক লিখেছেন। আমি তখন সিদ্ধান্ত নিলাম, মেসমেরিজম এর মাধ্যমে মির্যা সাহেবের ওপর প্রভাব বিস্তার করব। আর তিনি যখন বৈঠকে বা মজলিসে উপবিষ্ট থাকবেন তখন তাঁর ওপর মনোসংযোগ করে তাঁর মুরীদ বা ভক্তদের সামনে তাঁকে হেয় প্রমাণ করব। এই উদ্দেশ্যে একটি বিয়ে উপলক্ষে আমি কাদিয়ান যাই। মজলিস বা বৈঠক চলছিল আর আমি দরজায় বসে মির্যা সাহেবের ওপর মনোসংযোগ আরম্ভ করি। তিনি অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নসীহত মূলক কিছু কথা বলছিলেন। সেই ব্যক্তি বলে, আমি মনোসংযোগ করি কিন্তু তাঁর ওপর কোন প্রভাব পড়েনি। আমি ভাবলাম তাঁর সংকল্প শক্তি কিছুটা দৃঢ় তাই আমি পূর্বের চেয়ে অধিক মনোসংযোগ করা আরম্ভ করি কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর ওপর কোন প্রভাব পড়েনি আর তিনি একইভাবে তাঁর আলাপচারিতায় রত থাকেন। আমি ভাবলাম, তাঁর সংকল্প শক্তি আরো বেশি দৃঢ় তাই আমি আমার যা কিছু জানা ছিল তার পুরোটা কাজে লাগাই আর নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করি। কিন্তু আমি যখন সর্বশক্তি নিয়োজিত করি তখন আমি দেখি, একটি সিংহ আমার সামনে বসে আছে আর আমার ওপর আক্রমনে উদ্যত। এক জায়গায় এটিও বর্ণনা করা হয়েছে, প্রত্যেক বারই সিংহ দেখা যেত কিন্তু শেষবার সেই সিংহকে আক্রমনের জন্য উদ্যত দেখা গেলো। যাহোক সে বলে, সিংহ দেখে ভয়ে আমি আমার জুতা নিয়ে সেখান থেকে ছুটতে থাকি। আমি যখন দরজার কাছে পৌঁছি তখন মির্যা সাহেব তাঁর শিষ্যদের বলেন, দেখ তো এ ব্যক্তি কে। তখন এক ব্যক্তি আমার পিছনে সিঁড়ি বেয়ে নীচে আসে এবং মসজিদের পাশের চত্বরে সে আমাকে ধরে ফেলে। আমি যেহেতু তখন কান্ডজ্ঞানশূন্য ছিলাম তাই আমি সেই ব্যক্তিকে বললাম, এখন আমাকে যেতে দাও কেননা আমার কান্ডজ্ঞান সঠিকভাবে কাজ করছে না। আমি পরে পুরো ঘটনা মির্যা সাহেবকে লিখে পাঠাব। তাকে ছেড়ে দেয়া হয় এবং পরবর্তীতে সে এই পুরো ঘটনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে লিখে পাঠায় এবং বলে, আমি অপরাধ করেছি। আমি আপনার পদমর্যাদা শনাক্ত করতে পারি নি বা বুঝতে পারি নি তাই আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, লাহোরের মিঞাঁ আব্দুল আযীয মোগল সাহেব শোনাতেন, তার বংশের অনেকে এখানেও আছে। তিনি বলতেন, আমি সেই হিন্দুকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এটি কেন ভাবলে না যে, মির্যা সাহেব মেসমেরিজম বা সম্মোহোন বিদ্যা জানেন আর এ বিদ্যায় তোমার চেয়ে বেশি দক্ষ। সে বলে, এটি অসম্ভব, কেননা এর জন্য মনোযোগ বা মনোসংযোগ আবশ্যক আর এর জন্য পূর্ণ নিরবতা-নিথরতার প্রয়োজন, কিন্তু মির্যা সাহেব যেহেতু আলাপচারিতায় রত ছিলেন তাই আমি বুঝতে পেরেছি, তার সংকল্প শক্তি জাগতিক নয় বরং ঊর্ধ্বলোকের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, অতএব যে সংকল্প শক্তি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে মানুষকে দেয়া হয় এবং যা পূর্ণ ঈমানের ফলে সৃষ্টি হয় তার মাঝে এবং মানুষের সংকল্প শক্তির মাঝে দু'মেরুর পার্থক্য রয়েছে। যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'লা সংকল্প শক্তি দান করেন তার সামনে মানবীয় সংকল্প শক্তি তো বালকের খেলা-তুল্য। যেভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর ছড়ির মোকাবিলায় জাদুকরদের সাপ ব্যর্থ হয়েছিল অনুরূপভাবে খোদার প্রিয়দের সংকল্প শক্তি যখন প্রকাশ পায় তখন এ ধরনের সংকল্প শক্তির অধিকারী অর্থাৎ জাগতিক সংকল্প শক্তি যারা রাখে তারা তুচ্ছ প্রমাণিত হয়।

এরপর জাতিগত উন্নতির জন্য কী কী প্রয়োজন এবং ধর্মীয় বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আত্মাভিমান কোন পর্যায়ে ছিল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্য তাঁর আত্মাভিমান কেমন ছিল, একবার এটি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন,

জাতিগত উন্নতির জন্য সকল সত্য বা পুরো সত্যকে আত্মস্থ করা বা ধারণ করা আবশ্যক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মসলা-মাসায়েল এবং বিশ্বাস সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। এমন নয়, শুধু ঈসার মৃত্যুতে বিশ্বাস রাখবো আর এটি বলবো যে, আমাদের জন্য এটিই যথেষ্ট। বরং ওফাতে মসীহ্ বা ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সংক্রান্ত বিষয়কে সামনে রেখে ভাবা উচিত, ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতে বিশ্বাস করা কেন আবশ্যক? হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকা সংক্রান্ত বিশ্বাসের যেই বিষয়টি আমাদের পীড়া দেয় তাহলো, প্রধানত ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকার বিশ্বাসের ফলে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় অথচ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সম মর্যাদার কোন নবী পূর্বেও আসেনি আর পরেও আসবে না। আর ঈসা (আ.)-কে জীবিত মানলে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর ঈসা (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় অথচ তিনি (সা.)-ই সারা বিশ্বের সত্যিকার অর্থে সংশোধন করেছেন– আর এই বিশ্বাস ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। আমরা তো এক মুহূর্তের জন্যও এমন ধারণা নিজেদের হৃদয়ে স্থান দিতে পারি না যে, ঈসা (আ.) মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চেয়ে শ্রেয় বা শ্রেষ্ঠ ছিলেন আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) মাটির নিচে কবরস্থ আছেন আর হযরত ঈসা (আ.) চতুর্থ আকাশে বসে আছেন, এই বিশ্বাস পোষণ করলে ইসলামের চরম অসম্মান বা অবমাননা হয়।

ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকায় বিশ্বাস করলে দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমাদের পীড়া দেয় তাহলো, এরফলে আল্লাহ্ তা'লার তৌহীদ বা একত্ববাদেও ওপর আঘাত আসে। এই দু'টো কারণেই ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়ে আমাদের জোর দিতে হয়। যদি এই বিষয়গুলো না থাকতো তাহলে ঈসা (আ.) আকাশে থাকুন বা মাটিতে তাতে আমাদের কিছুই যেতো আসতো না। কিন্তু যেহেতু তার আকাশে আরোহন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং ইসলামের অসম্মানের কারণ এবং তৌহীদের পরিপন্থী তাই আমরা এই বিশ্বাসকে কীভাবে সহ্য করতে পারি? এই বিশ্বাসকে মানার তো প্রশ্নই উঠে না বরং আমরা একথা শোনাও পছন্দ করবো না, ঈসা (আ.) হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমরা সচরাচর দেখি, সাধারণ আহমদীরা যখন ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সংক্রান্ত বিষয়ে বিতর্ক করে আর নিজের যুক্তি এবং প্রমাণ উপস্থাপন করে তখন তাদের মাঝে কোন আবেগ বা উচ্ছাস পরিলক্ষিত হয় না বরং তারা বিষয়টি এমনভাবে বর্ণনা করে যেভাবে সাধারণ কথাবার্তা হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে দেখেছি, তিনি যখন ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়টি উঠাতেন তখন তিনি আবেগ বা উত্তেজনার বশে কাঁপতে থাকতেন আর তাঁর কণ্ঠস্বর এত প্রতাপান্বিত হতো, মনে হতো তিনি যেন ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকা সংক্রান্ত বিশ্বাসকে টুকরো টুকরো করছেন। তাঁর অবস্থা তখন

সম্পূর্ণরূপে বদলে যেত। আর তিনি সুগভীর আবেগ এবং উত্তেজনার সাথে একথা উপস্থাপন করতেন, পৃথিবীর উন্নতির পথে একটি অনেক বড় পাথর বা অন্তরায় বাঁধ সাধছিল যা আমি উঠিয়ে দূরে ছুড়ে ফেলছি। পৃথিবী অন্ধকারের গহ্বরে নিপতিত হচ্ছিল কিন্তু আমি তাকে আলোর ময়দানের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। তিনি (আ.) যখন এই বক্তৃতায় রত থাকতেন তখন তাঁর কণ্ঠে একটি বিশেষ উত্তেজনা পরিলক্ষিত হতো আর এমন মনে হতো, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সিংহাসনে ঈসা আসীন হয়েছেন যিনি তাঁর সম্মান ছিনিয়ে নিয়েছেন আর তিনি (আ.) তার অর্থাৎ ঈসার কাছ থেকে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সিংহাসন ফিরিয়ে নিতে চান। এ-তো ছিল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আত্মাভিমান। কিন্তু বর্তমান আলেমদের জন্য আক্ষেপ! মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্য এত গভীর আত্মাভিমান এবং প্রেরণা যে ব্যক্তি লালন করতেন তার সম্পর্কে বলা হয়, তিনি নাকি নাঊযুবিল্লাহ্ নিজেকে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চেয়ে বড় মনে করতেন বা আহমদীয়াতকে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মনে করতেন।

আরো একটি ঘটনা হলো, আল্লাহ্ তা'লা যখন কাউকে কোন উচ্চপদে আসীন করেন {এটি ঘটনা নয় বরং মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজেই এটি বর্ণনা করেছেন} তখন তাকে কীভাবে পথের দিশা দেন আর কীভাবে মানুসের আভ্যন্তরীণ চিত্র তাদের সামনে প্রকাশ করেন সেই সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, মানুষ যখন সুউচ্চ মর্যাদায় উপনীত হয় অর্থাৎ যাকে আল্লাহ্ তা'লা দাঁড় করান সে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আপনা-আপনিই দিক নির্দেশনা লাভ করে আর এমন প্রচ্ছন্ন দিক নির্দেশনা সে লাভ করে যাকে ইলহামও বলা যায় না আবার সেটি সম্পর্কে আমরা একথাও বলতে পারি না যে, তা ইলহাম থেকে ভিন্ন কিছু। ইলহাম আমরা এজন্য বলতে পারি না, সেটি আক্ষরিক অর্থে ইলহাম হয় না আর ইলহাম নয় একথাও আমরা এ কারণে বলতে পারি না কেননা; তা কার্যতঃ ইলহাম হয়ে থাকে আর মানব হৃদয়ে খোদার জ্যোতি অবতীর্ণ হয়ে এটি সুস্পষ্ট করে, বিষয়টি এমন অথচ শাব্দিকভাবে এটি এত স্পষ্ট করে বলা হয় না। তিনি বলেন, অনেক সময় যখন এর চেয়েও স্পষ্টভাবে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে কোন কথা জানানো হয় তখন সেটিকে কাশ্‌ফ বা দিব্য দর্শন বলা হয়। যখন স্পষ্টভাবে (জাগ্রত অবস্থায়) হয় তখন কাশ্‌ফও হয়ে থাকে। যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, অনেক মানুষ যখন আমার সামনে আসে তখন তাদের ভেতর থেকে আমি এমন কিরণ বের হতে দেখি যা থেকে আমি বুঝতে পারি, তাদের ভেতর এই এই ত্রুটি আছে বা অমুক গুণাবলী রয়েছে। কিন্তু তাদেরকে সেই ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করার অনুমতি থাকে না। আল্লাহ্ তা'লার এটিই রীতি, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজের ফিতরত বা আভ্যন্তরীণ অবস্থা নিজেই তুলে না ধরে– তিনি তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন না। তাই এই রীতির অধীনে নবীগণ এবং তাঁদের প্রতিচ্ছবি লোকদের রীতি হলো, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা কারো সামনে উল্লেখ করেন না যতক্ষণ সেই ব্যক্তি নিজের রোগ-ব্যাধি নিজেই প্রকাশ না করে দেয়।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রিয়দের সত্যতা প্রমাণের জন্য কীভাবে অন্যদেরকেও নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা যা এক অ-আহমদীর সাথে ঘটেছে তা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, কোন মানুষের দেহ থেকে এমন কিরণ কীভাবে নির্গত হতে পারে যা অন্যদেরও দৃষ্টিগোচর হয়– এই ধারণা শুধুমাত্র এই কারণে মানুষের মনে দানা বাঁধে কেননা, মানুষ এই নিদর্শনকে বাহ্যিক অর্থে নিয়ে থাকে। যদি তারা বুঝত, এটি একটি দিব্য দর্শনের অভিজ্ঞতা তাহলে এমন ভুল ধারণা বা কুমন্ত্রনাও তাদের হৃদয়ে সৃষ্টি হতো না। মূসার যুগ তো অনেক দূরের কথা আমরা দেখি যে এ যুগেও আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এমন কতক নিদর্শন দেখিয়েছেন যাতে দিব্যদর্শনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আল্লাহ্ তা'লার ঐশী জ্যোতিকে বাহ্যিক রূপেও প্রতিফলিত হতে দেখেছেন এবং এর আধ্যাত্মিক স্বাদও তারা উপভোগ করেছেন। যেমন ১৯০৪ সনে যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লাহোর যান তখন সেখানে এক সভায় তিনি বক্তৃতা করেন। এক অ-আহমদী উকিল বন্ধু শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেবও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, বক্তৃতা চলাকালে আমি দেখেছি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাথা থেকে নূরের একটি স্তম্ভ নির্গত হয়ে আকাশের দিকে যাচ্ছে। তখন আমার সাথে আরো এক বন্ধু বসে ছিলেন। আমি তাকে বললাম, দেখ তো এটি কী? দ্বিতীয় বন্ধুও সেটি দেখে তাৎক্ষণিকভাবে বলেন, এটি তো আলোর এক স্তম্ভ যা হযরত মির্যা সাহেবের মাথা থেকে বের হয়ে আকাশ পর্যন্ত প্রলম্বিত রয়েছে। শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেবের ওপর এই দৃশ্যের এমন প্রভাব পড়ে যে, তিনি সেদিনই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেন।

এগুলো এমন সব নির্দশন যা দেখে মানুষ ঈমান লাভ করেছে আর শুধু তাই নয় বরং নিদর্শনের বিভিন্ন প্রকার ও প্রকৃতি রয়েছে যা আল্লাহ্ তা'লা এখনো মানুষের সামনে প্রকাশ করে চলেছেন যেমন গত এক জুমুআর পূর্বের খুতবায় সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাও আমি বর্ণনা করেছিলাম।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এক বৈঠকের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমার মনে আছে এক বন্ধু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে লিখেছেন, আমার বোনের কাছে জ্বীন আসে। আমাদের দেশেও আর আরবদের মাঝেও এই ধারণা প্রচলিত রয়েছে, মানুষের ওপর জ্বীন ভর করে। আর জ্বীন তাড়ানোর জন্য যার ওপর বা যে বেচারার ওপর জ্বীন ভর করে তার ওপর অনেক অত্যাচার করা হয়। অনেক বেচারার অর্থাৎ যার ওপর জ্বীন ভর কওে জ্বীন বের করার জন্য অনেক সময় তাদের মেরেও ফেলা হয়। যাহোক, কেউ একজন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে নিবেদন করে, আমার বোনের কাছে জ্বীন আসে আর সেই জ্বীনেরা এমন, তারা বলে, আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওপর ঈমান আনার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাকে পত্র লিখেন, আপনি সেই জ্বীনদের এই বার্তা পৌঁছে দিন, একজন মহিলাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ বা বিরক্ত করছ? যদি কষ্ট দিতেই হয় বা বিরক্ত করতেই হয় তাহলে মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী বা মৌলভী সানাউল্লাহ্ সাহেবকে গিয়ে কষ্ট দাও বা বিরক্ত কর। এক হতভাগিনী নারীকে কষ্ট দিয়ে কী লাভ? হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এমন কোন জ্বীন নেই যা সাধারণ মানুষ মনে করে থাকে। নিঃসন্দেহে এমন কিছু মানুষও থেকে থাকবে যারা নিজেদের ইংরেজী শিক্ষা-দিক্ষার কল্যাণে পূর্বেই এই বিশ্বাস পোষণ করে, জ্বীন বলতে কিছু নেই। কিন্তু মু'মিনের কাছে আসল প্রশ্ন এটি নয়, তার বিবেক বা কমনসেন্স কী বলে বরং আসল প্রশ্ন হলো, কুরআন কী বলে? মু'মিনকে এভাবে ভাবা উচিত। যদি কুরআন বলে, সাধারণ মানুষ যেমন জ্বীনের ধারণা রাখে তেমন জ্বীনই

রয়েছে– তাহলে আমরা মানলাম এবং সত্যায়ণ করলাম। আর যদি কুরআন থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের বাইরে জ্বীন বলতে কোন সৃষ্টি নেই তাহলে আমাদেরকে এই কথা মানতে হবে। যাহোক, মু'মিনকে সর্বাবস্থায় কুরআনের কথাই শিরোধার্য করতে হবে।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা তার প্রিয়দের সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য পাগল এবং উন্মাদদের ওপরও কীভাবে স্বীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন এতদসংক্রান্ত ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, যা আমরা পূর্বেও কয়েকবার শুনেছি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজেই শোনাতেন, একবার তিনি লাহোর যান। কিছু বন্ধু নিবেদন করে বলেন, সাদরায় এক পাগল থাকে, তার কাছে যাওয়া উচিত। কিন্তু অপর কয়েকজন বন্ধু এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং বলেন, সে অনেক নোংরা গালি দেয় তাই তার কাছে যাওয়া সমীচীন হবে না। কিন্তু যারা যাওয়ার পক্ষে ছিল তারা বলে, তাঁর (আ.) ওপর ইলহাম হয়, শোনা উচিত যে, সে কী বলে। অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইলহামকে যাচাই করার জন্য একটিই মাপকাঠি তাদের দৃষ্টিগোচর হয় যে, এই ব্যক্তির কাছে যাওয়া উচিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজেও যেতে অস্বীকার করেন কিন্তু মানুষ জোরাজুরি করে তাকে নিয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, আমরা যখন সেখানে পৌঁছাই তখন সেই ব্যক্তি গালি দিতে দিতে হঠাৎ নির্বাক হয়ে যায়। তার কাছে একটি বাঙ্গি বা তরমুজ রাখা ছিল। সে তা হাতে নিয়ে আমার কাছে উপস্থাপন করে আর বলে, এটি আপনার জন্য উৎসর্গ করছি। যারা কেবল বাহ্যিক কথাবার্তার প্রতি দৃষ্টি দেয়, এমনটি দেখে তাদের হৃদয়ে তার প্রতি আরো ভক্তি জন্মে কিন্তু তিনি (আ.) বলেন, সে এক পাগল। অতএব অনেক সময় পাগলরাও এমন অনেক বিষয়ে দেখে থাকে যা বুদ্ধিমানদের জন্য দেখা সম্ভব হয় না। যেহেতু এই জগতের সাথে তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন থাকে তাই অনেক সময় অদৃশ্যের কিছু বিষয় তাদের চোখেও ধরা পড়ে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিদর্শনাবলী এবং মো'জেযা হতে কতক হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন; এর কয়েকটি আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। বাউলো বা পাগলা কুকুরে কামড়ানো এবং সেই রোগীর আরোগ্য লাভ সংক্রান্ত একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সেটি এভাবে বর্ণনা করেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের সকল ঘটনা যেহেতু সংরক্ষিত নয় তাই এই ধরনের খুব বেশি দৃষ্টান্ত এখন পাওয়া যায় না। নতুবা আমি মনে করি এমন শত শত বরং হাজার হাজার দৃষ্টান্ত তাঁর (সা.) জীবনে রয়েছে। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে যখন কি-না নাস্তিকতার প্রবল স্রোত বইছিল আর তা খণ্ডনের জন্য ঐশী নিদর্শনের অসাধারণ প্রয়োজন তাই আল্লাহ্ তা'লা এ ধরনের বহু নিদর্শন দেখিয়েছেন যার মাধ্যমে আমরা মহানবী (সা.)-এর নিদর্শনের কথা কিছুটা হলেও অনুমান করতে পারি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি আব্দুল করীম সাহেব নামের এক ব্যক্তির ঘটনা শোনাচ্ছি যিনি কাদিয়ানের স্কুলে পড়াশুনা করতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাকে পাগলা কুকুর কামড় দেয় যার ফলে তাকে চিকিৎসার জন্য কাসৌলি পাঠানো হয়। বাহ্যতঃ তার চিকিৎসা সফল হয়েছিল। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের কিছুদিনের মাথায় পুনরায় রোগের প্রকোপ দেখা দেয়। তখন কোন ব্যবস্থাপত্র চেয়ে কাসৌলি টেলিগ্রাম পাঠানো হলে উত্তর আসে, ঘড়ঃযরহম ঈধহ ইব উড়হব ঋড়ৎ অনফঁষ কধৎরস অর্থাৎ দুঃখের বিষয়, এখন আর আব্দুল করীমের জন্য আর কিছুই করার নেই। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে তার রোগের বিষয়টি অবহিত করা হয়। যেহেতু তখন জামা'তের কেবল সূচনা ছিল এবং প্রাথমিক যুগ ছিল আর এই ব্যক্তি দূর-দুরান্তের অঞ্চল হায়দ্রাবাদ দক্ষিণের একটি গ্রাম থেকে শিক্ষার জন্য এসেছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে গভীর সহানুভূতি জাগে এবং তিনি তার আরোগ্যের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করেন আর বলেন, ইনি এত দূর থেকে এসেছেন। তার এভাবে মৃত্যু হবে! এ কথায় হৃদয় সায় দেয় না। এক জায়াগায় তিনি এও বলেছেন, তার মা গভীর আগ্রহ এবং প্রেরণা নিয়ে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য এমন এক প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে তাকে পাঠিয়েছেন। এই কারণেও আমার হৃদয়ে তার পক্ষে দোয়ার প্রেরণা সঞ্চার হলো। যাহোক, এই দোয়ার ফলাফল যা দাঁড়িয়েছে তাহলো, রোগের আক্রমনের পর আল্লাহ্ তা'লা তাকে পূর্ণ আরোগ্য দান করেন অথচ মানুষের সৃষ্টি হতে অদ্যবধি এমন রোগী কখনও আরোগ্য লাভ করেনি। (তখনকার চিকিৎসা শাস্ত্রের ইতিহাস অন্তঃতপক্ষে একথাই বলে)

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমার এক ডাক্তার আত্মীয় আছেন। তিনি এখনো ডাক্তারী করেন। তিনি তার ছাত্র জীবনের ঘটনা শুনিয়েছেন, একবার আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে অন্য এক ছাত্রের সাথে তিনি আলাপ করছিলেন। আলোচনা কালে তিনি এই ঘটনাটি স্বাক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপন করেন, আল্লাহ্ তা'লা আছেন, তিনি এভাবে দোয়া শোনেন এবং এভাবে এই রোগী আরোগ্য লাভ করেছে। সেই ছাত্র যার সাথে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব নিয়ে কথা হচ্ছিল এবং যে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো না সে বলে, এমন রোগীর বাঁচা সম্ভব। এটি এমন অসম্ভব কোন বিষয় নয়। তিনি বলেন, দৈবক্রমে সেদিন কলেজে প্রফেসরের লেকচার ছিল "কুকুরে কামড়ানো রোগীর অবস্থা" সম্পর্কে। প্রফেসর যখন লেকচারের জন্য দন্ডায়মান হন এবং এই কথার ওপর জোর দেওয়া আরম্ভ করেন, এই রোগ বা জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসা রোগের আক্রমনের পূর্বেই করা উচিত আর কালক্ষেপণ না করে অচিরেই সেদিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত। তিনি বলেন, আমি এ কথা সুস্পষ্ট করানোর জন্য বললাম, জনাব! অনেকে বলে, এই রোগের প্রকোপ দেখা দেওয়ার পরও রোগী আরোগ্য লাভ করতে পারে। তখন অধ্যাপক তাকে ভর্ৎসনা করে বলেন, এটি কখনো সম্ভব নয়। যে এমন কথা বলে সে নির্বোধ। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এক কথায় এটি এমন এক রোগ ছিল যার কোন চিকিৎসা হওয়া ছিল অসম্ভব আর কখনো হয়ও নি। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়ার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা মিঞাঁ আব্দুল করীমকে আরোগ্য দান করেন আর তিনি আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখনও জীবিত আছেন অর্থাৎ, সেই সময় যখন তিনি (রা.) এটি বর্ণনা করছিলেন। অতএব প্রমাণিত হলো, প্রকৃতির এই স্বাভাবিক নিয়মের ঊর্ধ্বেও এক সিদ্ধান্তকারী সত্তা রয়েছেন যার হাতে রয়েছে আরোগ্য।

তিনি (রা.) আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে আমেরিকা থেকে দু'জন পুরুষ এবং একজন মহিলা আসে। তাদের মধ্য হতে একজন পুরুষ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে তাঁর দাবী সম্পর্কে কথা উত্থাপন করে। আলোচনাকালে হযরত মসীহ্ নাসেরী বা ঈসা (আ.)-এর কথাও উল্লেখ করা হয়। সেই ব্যক্তি বলে, তিনি তো খোদা ছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, তার

খোদা হওয়ার তোমার কাছে কী প্রমাণ আছে? সে বলে, তিনি নিদর্শনাবলী বা মো'জেযা দেখিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন, নিদর্শনাবলী তো আমরাও প্রদর্শন করি। সে ব্যক্তি বলল, আমাকে কোন মো'জেযা বা নিদর্শন দেখান। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) উত্তর দেন, তুমি স্বয়ং আমার মো'জেযা বা নিদর্শন। অর্থাৎ, যে আমেরিকান প্রশ্ন করেছে তাকে বলেন, তুমি স্বয়ং আমার নিদর্শন বা মো'জেযা। এটি শুনে সে হতভম্ব হয়ে যায় আর বলে, আমি কীভাবে মো'জেযা বা নিদর্শন হতে পারি? তিনি (আ.) বলেন, কাদিয়ান অতি ক্ষুদ্র এবং অপরিচিত একটি গ্রাম ছিল। সামান্য খাদ্যসামগ্রীও এখানে পাওয়া যেত না, এমনকি এক রূপীর আটাও পাওয়া যেত না। আর কারো প্রয়োজন হলে সে গম কিনে ভাঙ্গিয়ে নিত। তখন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সংবাদ দিয়েছিলেন, "আমি তোমার নামকে পৃথিবীতে সমুন্নত করব আর সারা পৃথিবীতে তোমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। চতুর্দিক থেকে মানুষ তোমার কাছে আসবে এবং তাদের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণও এখানেই চলে আসবে"। "ইয়া'তূনা মিন কুল্লি ফাজ্জিন আমীক্ব" অর্থাৎ, সকল জাতি এবং সকল দেশের মানুষ তোমার কাছে আসবে। "ইয়া'তীকা মিন কুল্লি ফাজ্জিন আমীক্ব" অর্থাৎ এত বেশি মানুষ আসবে, তারা যেসব পথ ধরে আসবে সেগুলো গর্তবহুল এবং গভীর হয়ে যাবে। এখন দেখ! পথ কতটা গর্তবহুল হয়ে গেছে। বাটালা থেকে কাদিয়ান পর্যন্ত যে রাস্তা রয়েছে সেই রাস্তায় গত বছরই সরকার দু'হাজার রূপীর মাটি ফেলেছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাকে বলেন, তুমি আমেরিকা থেকে আমার কাছে এসেছ। আমার সাথে তোমার কিসের সম্পক? দাবী করার আগে আমাকে কে জানত? কিন্তু আজ তুমি এত দূর থেকে আমার কাছে হেঁটে এসেছ এটিই আমার সত্যতার নিদর্শন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমার ভালভাবে স্মরণ আছে, যখন এই আলোচনা হচ্ছিল আর সেই ব্যক্তি বলেছিল, আপনি আমাকে আপনার কোন মো'জেযা বা নিদর্শন দেখান তখন সবাই হতবাক হয়ে গিয়েছিল, এখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর কী উত্তর দিবেন? সবাই ভেবেছিল, তিনি (আ.) হয়তো এমন কোন বক্তৃতা করবেন যাতে মো'জিযা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিবেন, কীভাবে তা প্রকাশ পায়। কিন্তু যখনই সেই ব্যক্তি তার কথা শেষ করে এবং তাঁকে (আ.) ইংরেজী থেকে উর্দূতে অনুবাদ করে শোনানো হয়, তিনি তৎক্ষণাৎ এই উত্তর দেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এটি একটি সামান্য কথা ছিল কিন্তু সবার পক্ষে এটি বোঝা সম্ভব নয়। এখনও প্রত্যেক এমন মানুষ যে বিবেক বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না সে বলবে, এটি কিসের নিদর্শন? কিন্তু যাদের দৃষ্টি উন্মুক্ত এবং যারা বিবেক-বুদ্ধি রাখে তারা বুঝতে পারবে, এটি অনেক বড় একটি নিদর্শন আর সত্য গ্রহণকারীর জন্য এটিই যথেষ্ট।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেছেন, আমার সত্যতার স্বপক্ষে লক্ষ লক্ষ নিদর্শন দেখানো হয়েছে। কিন্তু আমি বলব, এত বেশি নিদর্শন দেখানো হয়েছে যে, তা গণনা করে শেষ করা যাবে না কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক নির্বোধ এমন আছে যারা বলে, এত সংখ্যক তো মির্যা সাহেবের ইলহামও নেই তাহলে নিদর্শনাবলী কীভাবে এত বেশি হতে পারে? কিন্তু যারা বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ তারা খুব ভালভাবেই জানে, লক্ষ লক্ষ নিদর্শন তো একটি মাত্র ইলহাম থেকেও প্রকাশ পেতে পারে।

একটা প্রসিদ্ধ কাহিনী রয়েছে, এক ব্যক্তি ছিল। সে তার ভাতিজাদের বলল, আগামীকাল আমি তোমাদের এমন একটি লাড্ডু খাওয়াব যা বেশ কয়েক সহস্র বরং লক্ষ লক্ষ মানুষ বানিয়েছে। দ্বিতীয় দিন তারা যখন খাবার খেতে বসল তখন তারা লাড্ডু খাওয়ার প্রত্যাশায় আর কিছু না খেয়ে চাচাকে বলে, সেই লাড্ডু দিন। সেই ব্যক্তি একটি সামান্য লাড্ডু বের করে তাদের সামনে রাখে এবং বলে, এটিই সেই লাড্ডু যার প্রতিশ্রুতি আমি তোমাদের দিয়েছিলাম। এটি দেখে তারা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়, এটি কী করে লক্ষ লক্ষ মানুষের বানানো লাড্ডু হতে পারে? চাচা বলেন, তোমরা কাগজ কলম নিয়ে লেখা আরম্ভ কর আমি তোমাদের খুলে বলছি, সত্যিই এই লাড্ডু বেশ কয়েক লক্ষ মানুষ মিলে বানিয়েছে। দেখ! একজন ময়রা এটি বানিয়েছে। এটি বানানোর জন্য যে সমস্ত জিনিস ব্যবহৃত হয়েছে তা সেই ময়রা বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে ক্রয় করেছে। আর এর প্রতিটি বস্তু তৈরির পিছনেও সহস্র সহস্র মানুষের হাত রয়েছে যেমন চিনির কথাই ভাব! তা প্রস্তুতের জন্য কত মানুষকে পরিশ্রম করতে হয়েছে। কতক তা মাড়াই করেছে, কতক রস বের করেছে, কেউ ক্ষেত থেকে এনেছে, কেউ হাল চালিয়েছে, কেউ পানি সিঞ্চন করেছে। আবার হালের জন্য যে লোহা এবং কাঠ ব্যবহৃত হয়েছে এর প্রস্তুতকারীরা রয়েছে। এভাবে যদি সবার হিসাব কর তাহলে মানুষের সংখ্যা কত দাঁড়াবে? এরপর চিনি ছাড়া এতে আটাও রয়েছে। আটা প্রস্তুতকারীর কথা চিন্তা কর। এভাবে কী সংখ্যা এত দাঁড়ায় না? ভাতিজারা একথা শুনে বলে, হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন। এই কথাটি সেই বালকরা বুঝতে পারেনি কিন্তু সেই ব্যক্তি যেহেতু বুদ্ধিমান ছিলেন তাই তিনি দেখেছিলেন, একটি লাড্ডু প্রস্তুতের জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে শ্রম দিতে হয়।

এটি তো জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি নসীহত করেছেন কিন্তু যারা আধ্যাত্মিক জগতের বুযূর্গ বা নেক মানুষ তারাও এমনই করেছেন। এরপর তিনি (রা.) মির্যা মাযহার জানে-জানার ঘটনা বর্ণনা করেন, তিনি বাটালার এক ব্যক্তি গোলাম নবীকে দু'টো লাড্ডু দেন। সে তা মুখে পুরে নেয় এবং খেয়ে ফেলে। কিছুক্ষণ পর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি সেই লাড্ডুগুলো কী করেছ? সে বলল, খেয়ে ফেলেছি। একথা শুনে তিনি অত্যন্ত বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, কী? খেয়ে ফেলেছ? সে বলল, হ্যাঁ খেয়ে ফেলেছি। এভাবে তিনি বার বার তাকে জিজ্ঞেস করতে থাকেন আর বিস্ময় প্রকাশ করতে থাকেন, তুমি এত দ্রুত খেয়ে ফেলেছ। সে ভাবল, ইনি কীভাবে খান তাও দেখা উচিত। একদিন কেউ একজন তার কাছে কিছু লাড্ডু নিয়ে আসে। সেগুলো থেকে একটি নিয়ে তিনি রুমালে রাখেন আর সেখান থেকে একটি টুকরা নিয়ে তিনি এই বক্তৃতা আরম্ভ করেন, আমি এক অর্থহীন এবং অযোগ্য ব্যক্তি। আমার জন্য আল্লাহ্ তা'লা এত বড় এক নিয়ামত পাঠিয়েছেন। এতে কী কী জিনিস রয়েছে আর কত লোক মিলে তা বানিয়ে থাকবে? আমার মত অযোগ্য ব্যক্তির জন্যই কী আল্লাহ্ তা'লা এই নিয়ামত পাঠিয়েছেন? এভাবে তিনি বক্তৃতা অব্যাহত রাখেন এবং নিজের বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করতে থাকেন আর এভাবে খোদার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে থাকেন। যোহর থেকে নিয়ে এই অবস্থার মাঝেই প্রথম যে দানা তিনি মুখে রেখেছিলেন শুধু তা-ই খেয়েছেন আর ইতোমধ্যে আসরের আযান হয়ে যায় আর তিনি তা ছেড়ে দিয়ে ওযু করার জন্য উঠে দাঁড়ান। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এটি কী ছিল? এটি এছাড়া আর কিছুই নয়, সেই লাড্ডুতে খোদা তা'লার সহস্র সহস্র নিদর্শন তার চোখে পড়ছিল। এমনিতে তো

এক ব্যক্তি চার-পাঁচটি বা দশ-বিশটি লাড্ডুও স্বল্প সময়ে খেয়ে ফেলতে পারে কিন্তু মাযহার জানে-জানার জন্য একটি লাড্ডু খাওয়াই এত কঠিন ছিল, খোদার অনুগ্রহরাজি স্মরণ করে তার কোমর ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। কাজেই বিবেকই একটি তুচ্ছ বস্তুকে অনেক বড় করে তোলে আর অজ্ঞতা দৃশ্যত একটি বড় বস্তুকেও তুচ্ছ প্রতিভাত করে। অনুরূপভাবে বিবেক বাহ্যত একটি বড় বস্তুকেও ছোট করে দেখায় আর নির্বুদ্ধিতা এক সামান্য বস্তুকেও বড় করে তুলে ধরে। অতএব বিবেকবান মানুষ ছোট-খাটো বিষয়েও খোদা তা'লার বড় বড় নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে আর নির্বোধ বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ কথাতেও কিছুই দেখতে পায় না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, আমার সত্যতার পক্ষে আল্লাহ্ তা'লা লক্ষ লক্ষ নিদর্শন প্রকাশ করেছেন। এটি একেবারেই সত্য এবং সঠিক কথা। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমার মতে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (আ.) সত্যতার পক্ষে এত বেশি নিদর্শন দেখিয়েছেন যে, তা গুণেও শেষ করা যাবে না; কিন্তু এগুলো কাদের জন্য নিদর্শন? এই যে নিদর্শন দেখিয়েছেন সেটি কাদের জন্য? শুধু তাদেরই জন্য যাদের বিবেক-বুদ্ধি আছে। যদি কোন ব্যক্তি তাঁর সত্যতার নিদর্শন দেখার জন্য এখানে আসে তাহলে এখানে অর্থাৎ, কাদিয়ানে যত ভবন বা অট্টালিকা রয়েছে, তিনি (রা.) বলেন, এখানে মসজিদে আকসায় দাঁড়িয়ে যা চোখে পড়ছে এগুলোর কয়েকটি ছাড়া বাকি সবই তাঁর সত্যতার নিদর্শন। এছাড়া আহমদীয়া বাজারের সামনে যত বাড়িঘর নির্মিত রয়েছে সেগুলোর জন্য জমি প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে যে মাটি ফেলা হয়েছে তার এক একটি বস্তা ছিল নিদর্শন। এখানে এত বড় এক গর্ত ছিল যে, হাতিও এতে ডুবে যাওয়া সম্ভব ছিল। মাটি ফেলে তা ভরাট করা হয়েছে এবং এরপর আবাদ হয়েছে। এরপর কাদিয়ানের বাইরে উত্তর দিকে এগিয়ে যান। সেখানে যে উঁচু উঁচু অট্টালিকা দেখা যাবে সেগুলোর প্রতিটি ইট আর চুনের প্রতিটি কনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শন। এছাড়া কাদিয়ানে বিরচণকারী যত মানুষ দেখা যায় তা সে হিন্দু হোক বা শিখ, অ-আহমদী হোক বা আহমদী তাদের সবাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শন। আহমদীরা এজন্য নিদর্শন, কারণ তারা তাঁর সত্যতার নিদর্শন দেখে নিজেদের বাড়িঘর পরিত্যাগ করে এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছে। আর অ-আহমদী ও অন্যান্য ধর্মের মানুষ যে কারণে তাঁর সত্যতার নিদর্শন তাহলো, তাদের জীবন যাপনের পদ্ধতি, পোষাক ইত্যাদি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবীর পূর্বে সেরূপ ছিল না যা এখন রয়েছে। তাদের পাগড়ী, তাদের জামা, তাদের পায়জামা, তাদের অট্টালিকা, তাদের ধন-সম্পদ তা ছিল না যা আজকে রয়েছে।

আজও কাদিয়ানের উন্নতি এ কথার সাক্ষী। মানুষ আজও কাদিয়ান গেলে এজন্যই যায়, এটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর গ্রাম। এ কারণে যায় না যে, এটি একটি শহর আর সাধারণ শহরের মতো এর জনবসতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উন্নতি করছে বা শহর বিস্তার লাভ করেছে। সেখানকার ব্যবসায়ীরা আজও এই আশায় বুক বাঁধে, এখানে জলসা হবে যা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সূচীত আর এর মাধ্যমে আমাদের ব্যবসা উন্নতি করবে। কাজেই এই শহরের এরূপ উন্নতি এবং অ-আহমদীদেরও আর্থিক দিক থেকে যে উন্নতি হচ্ছে সেটিও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কল্যাণেই হচ্ছে। যাহোক, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবীর পর মানুষ তাঁর কাছে আসে এবং তারাও লাভবান হয় এবং লা ইয়াশ্‌কা জালীসুহুম-এর কল্যাণে তারাও নিয়ামত লাভ করেছে। তাই এসবই তাঁর সত্যতার নিদর্শন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, এই মসজিদই অর্থাৎ যেখানে তিনি এই খুতবা দিচ্ছিলেন এই মসজিদের বিল্ডিং, এই কাঠ, এই স্তম্ভ এগুলো সবই নিদর্শন কেননা এগুলো পূর্বে ছিল না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন দাবী করেছেন এরপর এগুলো নির্মিত হয়েছে। অতএব লক্ষ লক্ষ নিদর্শন তো এখানেই দেখা সম্ভব। এরপর বার্ষিক জলসায় যত মানুষ আসে; তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি এক একটি নিদর্শন যা আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক বছর প্রকাশ করেন। আর যতদিন আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন তা প্রকাশ করতে থাকবেন। তাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর নিদর্শনের সংখ্যা অনুমান করতে গিয়ে খুব কমই বলেছেন, তা লক্ষ লক্ষ হবে। আমি বলব, এর সংখ্যা এত বেশি যে, কোন মানুষের পক্ষে তা গণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। শুধু খোদা তা'লাই তা ধারণা করতে পারেন। কিন্তু যেখানে এই নিদর্শনাবলী আমাদের জন্য ঈমানের দৃঢ়তার কারণ হয় সেখানে এই আয়াতের অধীনে একথাও বলে, প্রথমতঃ প্রত্যেক আগমনকারী ব্যক্তি চোখ খুলে দেখুক, এখানে কত নিদর্শনাবলী রয়েছে। এছাড়া সে নিজেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার একটি নিদর্শন। আর আজ পৃথিবীতে বিস্তৃত জামা'তে আহমদীয়ার মসজিদ, মিশন হাউস, জামেয়া, স্কুল, হাসপাতাল, স্থানীয় লোকদের তাঁর (আ.) প্রতি ভালবাসা এবং শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ সবই নিদর্শন। যার আধ্যাত্মিক চোখ আছে কেবল তার পক্ষেই এগুলো দেখা সম্ভব। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমার ভালভাবে মনে আছে, একজন মৌলভী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে আসে এবং বলে, আমি আপনার কোন নিদর্শন দেখতে এসেছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হেসে উঠেন এবং বলেন, মিঞাঁ! তুমি আমার বই হাকীকাতুল ওহী পড়ে দেখ। তুমি জানতে পারবে, আল্লাহ্ তা'লা আমার সমর্থনে কত নিদর্শন দেখিয়েছেন। তুমি সেগুলো থেকে কতটা লাভবান হয়েছ, আরো নিদর্শন দেখতে এসেছ?

অতএব যদি সেই ব্যক্তি দুই মিনিট বা পাঁচ মিনিটে পরিপূর্ণতা লাভকারী দু'চারটি ভবিষ্যদ্বাণী পেশ করত তাহলে আমরা তার কেবল দু'বছরই নয় বরং দু'শ বছরে পরিপূর্ণতা লাভকারী ভবিষ্যদ্বাণীতেও বিশ্বাস স্থাপন করতাম। আর বলতাম, যেহেতু আমরা দুই মিনিট বা পাঁচ মিনিটে পরিপূর্ণতা লাভকারী ভবিষ্যদ্বাণী দেখেছি তাই এই দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যদ্বাণীও অবশ্যই পূর্ণ হবে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি এ ধরনের স্বল্প মেয়াদী ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা না দেখিয়েই দীর্ঘ মেয়াদী ভবিষ্যাদ্বাণী করে তাহলে আমরা বলব, এটি বিবেক বহির্ভূত কথা। অপরদিকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর জীবদ্দশায়ও পূর্ণ হয়েছে আর আজও পূর্ণ হচ্ছে। আমি যেমনটি বলেছি, জামা'তের নিত্য দিনের উন্নতিই এর প্রমাণ।

এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী যেভাবে পূর্ণ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লা এর কল্যাণে যারা দেখতে পায় না তাদেরকেও দৃষ্টি শক্তি দিন যেন তারা তা দেখতে পায়। আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও প্রতিক্ষণ ও প্রতিটি মুহূর্ত ঈমানে উত্তরোত্তর দৃঢ়তা দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

# খেলাফত, শান্তি ও ন্যায়বিচার

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৫ম খলিফা হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) বিগত ৮ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্য আয়োজিত ১১তম জাতীয় শান্তি-আলোচনা সভায় মূল-বক্তব্য দান করেন। এ বক্তব্যে তিনি ISIS ও অন্যান্য চরমপন্থী গ্রুপের কার্যকলাপের নিন্দা জ্ঞাপন করে পর্যায়ক্রমিক ভাবে ওগুলোকে 'অনৈসলামিক'-আখ্যায়িত করে বলেন, ওগুলো বিশ্বে মারাত্মক এক-ভীতির নেটওয়ার্ক ছড়াচ্ছে। পবিত্র কুরআন থেকে বিস্তারিত উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি (আই.) এটা প্রমান করেন যে, ইসলাম হচ্ছে অনাবিল শান্তির ধর্ম, যেটা সমাজের সর্বস্তরে পারস্পরিক সম্মানবোধ এবং সমঝোতা বিস্তার করে। তিনি (আই.) এ প্রশ্নও উত্থাপন করেন যে, ISIS এর মত চরমপন্থী দলগুলো তাদের অর্থ ও সমর্থন কীভাবে সংগ্রহ করে থাকে?

এ অনুষ্ঠানটি লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদে হাজারের অধিক শ্রোতা-দর্শকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়, যার মধ্যে সরকারের মন্ত্রীবর্গ, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, উভয় কক্ষের পার্লামেন্ট-সদস্যবৃন্দের সংখ্যা ছিল ৫৫০ জনেরও বেশী। এতে আরো অনেক উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তা ও সম্মানিত অতিথি-বৃন্দও ছিলেন। এ বছরের এ শান্তি সম্মেলনের বিষয়বস্তু ছিলো- 'খিলাফত, শান্তি ও ন্যায় বিচার'।

উন্নয়নশীল বিশ্বের শিশুদেরকে খাদ্য প্রেরণ ও শিক্ষাদানে বিশেষ ভূমিকা রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ যুক্তরাজ্যের Mary's Meals এর CEO-Magnus Mac Farlane-Barrow- কে হুযূর (আই.) এই অনুষ্ঠানে আহমদীয়া মুসলিম শান্তি-পুরস্কার প্রদান করেন। মূল বক্তব্যের আগে যুক্তরাজ্য আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জাতীয় প্রেসিডেন্ট জনাব রফিক হায়াত, উইম্বেল্ডনের লর্ড তারিক আহ্‌মদ, সম্প্রদায়-বিষয়ক মন্ত্রী সিওভ্যাইন ম্যাকডোনার্ঘ- এমপি এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জন্য সর্বদলীয় পার্লামেন্টারী গ্রুপের প্রধান-সম্মানিত এড্‌ব্যারি, এমপি (অব.) সহ আন্তর্জাতিক-উন্নয়নের জন্যে এ্যানার্জি ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সচিব সম্মানিত জাষ্টিন গ্রীনিং, এমপি (অব.) বক্তব্য প্রদান করেন এবং শ্রদ্ধেয় কেভিন ম্যাকডোনাল্ড এমেরিটাস অব সাউথবার্ক ভ্যাটিকানদের পক্ষ থেকে এক বিশেষ-বার্তা পাঠ করেন।

তাশাহুদ, তা'উয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতেহা তেলাওয়াতের পর হুযূর (আই.) বলেন,

"সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সর্বপ্রথম আপনাদের সবাইকে, যারা এ বছরের এই শান্তি-সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন, তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আপনাদের অধিকাংশ লোকই অবহিত আছেন যে, এ বার্ষিক সম্মেলনটি বিগত দশক ধরে প্রতি বছরই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্ষ-পঞ্জিতে এটা এক স্থায়ী কর্মসূচী হয়ে গিয়েছে। আজ রাতে একটি রাষ্ট্রীয়- স্মরণ দিবসও অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, ফলে কতিপয় আমন্ত্রিত-অতিথি উপস্থিত না-ও হতে পারেন। এরপরও, যারা এখানে এসেছেন, তাদের সবার কাছেই আমি খুবই কৃতজ্ঞ। এ অনুষ্ঠানে আপনাদের অংশগ্রহণ এটা অবশ্যই প্রমান করে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের আঙ্গিকে আপনারা শান্তি সম্পর্কে বিশেষ কিছু শুনতে চান। কারণ, 'বিশ্ব-শান্তি' বিষয়ে আর সমগ্র বিশ্বজুড়ে যে সংঘর্ষ ঘটে চলছে, সে বিষয়ে আজকের বিশ্বে অনেক কথাই বলাবলি হচ্ছে। বিশ্বের বর্তমান অবস্থা অধিকাংশের জন্য অবশ্যই ভয় ও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিরাট দুঃখজনক অবস্থাদৃষ্টে একথা স্বীকার করতে আমার কোনই দ্বিধা নেই যে, বিশ্বে আমরা যে অশান্তি ঘটতে দেখি, তার অধিকাংশই কতিপয় নামসর্বস্ব মুসলমানদের কর্মের ফলে ঘটেছে। যে কোন শান্তিকামী মুসলমান, যে নিজ-ধর্মকে বুঝে, তার জন্যে এটা এক বিরাট দুঃখ ও আশাহত হওয়ার কারন বটে। বিগত বছর জুড়ে একটি বিশেষ দল বা গোষ্ঠি সন্ত্রাসের এক নেটওয়ার্ক ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে এবং সেটা বিশ্বের জন্য বিরাট এক দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। ISIS নামে পরিচিত সন্ত্রাসী-দলটির কথাই আমি বলছি।

এই সন্ত্রাসী-দলটির কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া কেবল মুসলিম দেশগুলোর ওপরই পড়ছে না বরং ইউরোপের দেশগুলোও এর ক্রুরতা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। আমরা দেখতে পাই যে, ইউরোপ এবং বিশ্বের অন্যান্য অংশ থেকে বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান যুবক, যারা যেকোনভাবেই হউক, ISIS ইসলামের এক সঠিক-চিত্র উপস্থাপন করে এমনই কথা বিশ্বাস করে তাদের আদর্শটি তারা সমর্থনও করে। এসব কারণে তারা তাদেরকে সাহায্য করতে এমনকি তাদের জন্য যুদ্ধ করতেও মনস্থ করেছে। এখানে, এই যুক্তরাজ্য থেকেও একথা বলা হয়ে থাকে যে, প্রায় পাঁচশ' লোক, যাদের অধিকাংশই হচ্ছে মুসলমান-যুবক, এমনই এক সন্ত্রাসী দলে ভর্তি হয়ে ISIS এর পক্ষে যুদ্ধ করতে ইতোমধ্যে সিরিয়া ও ইরাক রওনা হয়ে গেছে, তারা এ মিথ্যা-দাবীও করে যে, যুদ্ধটি করা হচ্ছে ইসলামের নামে। আমরা যদি ইউরোপের সেসব মুসলমানদের সংখ্যার দিকে তাকাই, যারা তথাকথিত এই 'জিহাদ' এর জন্য যাত্রা শুরু করেছে, তবে আমরা এটা অনুধাবন করতে পারি যে, উক্ত সংখ্যার লোক, যারা যুক্তরাজ্য থেকে ইরাক ও সিরিয়া যাচ্ছে, সে সংখ্যাটি জার্মানী অথবা বেশীর ভাগ অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলো থেকে যারা যাচ্ছে তাদের সংখ্যার চাইতে তুলনামুলকভাবে বেশী। এটা হচ্ছে যুক্তরাজ্যের জন্যে চরম-বিপজ্জনক এবং এক বিরাট চিন্তার বিষয়; ISIS -এর কর্মসূচী ও উদ্দেশ্য এবং তাদের তথাকথিত 'খলিফা'-এর সবটা হচ্ছে অত্যন্ত ভয়ংকর ও সম্পূর্ণভাবে বর্বর আচরণ বিশেষ।

উল্লেখ করা হয়, তাদের 'খলিফা' বলে, বিশ্বের কাছ থেকে সে প্রতিশোধ নিতে চায় এবং রাষ্ট্রগুলো ও দেশগুলো দখল করে নিতে চায়। মুসলমানদেরকে সে সমগ্র বিশ্বের প্রভু বানাতে চায় এবং সব অমুসলমানকে দাসে পরিনত করতে চায় অথবা 'মুসলমানদের অধিকারভুক্ত সম্পদ' বানাতে চায়। সে আরো বলে, সেসব লোকের প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া উচিত, যারা কোন মুসলমানকে যেকোন ভাবেই হোক আঘাত দেয় আর প্রত্যেক দেশের প্রতিটি ব্যক্তির ওপর তার কথিত শরীয়ত-আইন প্রযোজ্য হওয়া উচিত। এছাড়াও অন্যান্য ধর্ম অথবা গোত্রের মহিলাদের অধিকারকে সে হরন করার আকাঙ্খা রাখে, আকাঙ্খা রাখে তাদের দমন করতে এবং রক্ষিতায় পরিনত করতে, অথবা তাদেরকে তাদের স্ত্রী হতে বাধ্য করতে। ISIS প্রতিটি সেই ধর্ম অথবা গোত্রকে ধ্বংস করে দিতে চায় বিশ্বাসগত দিক থেকে যারা ভিন্নতা রাখে এবং বিদ্যমান মুসলমান সরকারগুলোকে তাদের নিজ ক্ষমতা থেকে অপসারণ বা উৎখাত করার ইচ্ছাও তারা পোষন করে।

এসব কথা যদি এভাবেই সত্য হয়, তবে তাদের কৌশল ও দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে সামগ্রিক বিনাশ সাধনের সুদূর-প্রসারী এক অপকর্মের কৌশল এবং তাদের মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বের শান্তি ধ্বংস ও নির্মূল করা। এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অবাস্তব এক আকাঙ্খা যে, ISIS কিংবা অন্যকোন চরমপন্থী দল শেষ পর্যন্ত বিশ্ব দখল করতে কখনো কৃতকার্য হয়ে যাবে।

কারণ, এটা খুবই স্পষ্ট, তাদের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ভাবেই বিবেক-বর্জিত এবং স্বেচ্ছাচারী-চিন্তাভাবনার ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর তা সম্পূর্ণরূপে মানবতা বিবর্জিতও বটে। এতদসত্ত্বেও তাদের চলার এই পথ থেকে তাদেরকে বিচ্যুত করা না হলে তাদের অবসান ঘটার পূর্বেই বিশ্ব এক বিশাল পরিমান ক্ষতি ও ধ্বংসের মুখে পতিত হবে। সন্ত্রাস ও ধ্বংসের অনেকগুলো ঘটনায় আমরা এটা প্রত্যক্ষ করেছি যে, কোন সহযোগীতা ও সমর্থন ছাড়া কোন একক-ব্যক্তি এমনটা ঘটাতে পারে না।

উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেক নূতন মাসেই নি:সঙ্গ এক ব্যক্তি কর্তৃক স্কুলে গুলি বর্ষনের মতো ন্যাক্কারজনক কর্মের কারণে ডজন ডজন নিস্পাপ শিশু নিহত হবার দুঃখজনক রিপোর্ট প্রকাশিত হচ্ছে। এভাবে শুধু এটাই চিন্তা করে দেখুন, একজন সন্ত্রাসী দ্বারা দুঃখ, কষ্ট ও বেদনার কত ঘটনাই না ঘটতে পারে, যার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে হতাশাগ্রস্থ ও ছিন্নমূল লোকেরা একত্রিত হচ্ছে, আর এই অন্যায়ের প্রতিকারে তারা নিজেদের প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।

এটা এক বাস্তব-সত্য যে, এদলটিতে কেবল আগ্রাসী ব্যক্তিরা রয়েছে শুধু তাই নয়, বরং তারা উন্নত-মানের ভারী অস্ত্র-শস্ত্রে এবং গোলন্দাজ-বাহিনী দ্বারা পর্যাপ্তভাবে সুসজ্জিতও। প্রকৃতই প্রশ্নাতীত কোন ব্যাপার এটা নয়, ঘটনাচক্রে পারমানবিক অস্ত্রও তাদের হাতে এসে যেতে পারে। আমরা জানি, এসব সন্ত্রাসী দল চিরস্থায়ী অথবা দীর্ঘস্থায়ী কোন সাফল্য অর্জন করতে পারবে না। কিন্তু এটা সম্ভব যে, অল্প কিছু দিনের মধ্যে তারা কতিপয় অঞ্চল দখল করতে পারে এবং বিশাল এক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটাতে পারে। ISIS- এর সাথে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সেসব দলের যে-কোনটিরই সম্পৃক্ততা থাকতে পারে যাদের একই রকম আদর্শ বিদ্যমান। এসব বিষয় বিবেচনা করা হলে, ISIS বিশ্বের জন্য আজ ভয়াবহ এক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে, এতে কোনই সন্দেহ থাকেনা।

ইসলামের নামে ঘটানো এসব ঘটনা শান্তি

প্রিয় সব খাঁটি মুসলমানকে দুঃখ ও যন্ত্রনা দেয়। কারণ, পাশবিক ও অমানবিক এমন কার্যকলাপের সাথে কোন ধর্মেরই কোন প্রকার সম্পর্ক থাকার কথা নয়। বরং প্রত্যেক উপায়ে এবং প্রতিটি পর্যায়ে ইসলামের আসল-শিক্ষাগুলো সব মানুষের জন্যই শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চিত শিক্ষাই বটে। পবিত্র কুরআনের দিকে যদি আমরা দৃষ্টি দেই এবং ইসলামের পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও চরিত্রের দিকে তাকাই, তবে এটা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, প্রথম দিকের মুসলমানগণ কোন যুদ্ধ অথবা অস্থিরতা কখনো শুরু করেনি। মুসলমানরা যদি কখনো কোন যুদ্ধে অংশ নিতেন, তবে সে যুদ্ধ ছিল সম্পূর্ণভাবেই প্রতিরোধ-মূলক এবং ওগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিলো অত্যাচারীদেরকে তাদের নিষ্ঠুরতা থেকে নিবৃত্ত করা, কখনই তাদের নিজস্ব শ্রেষ্ঠত্বের ওপর জোর দেয়া অথবা অবিচারকে সমর্থন করার জন্য নয়। তারা কখনই কোন ভূ-খণ্ড অথবা জাতিকে পদানত করতে, কিংবা মানুষকে বশ্যতা স্বীকার করাতে চাইতেন না।

মহানবী (সা.) এ সত্যের সাক্ষ্য বহন করেন যে, তাঁর নবুওতের প্রাথমিক-বছর গুলোতে তাঁর নিবাস-শহর মক্কায় তিনি শুধু ভালোবাসা ও স্নেহের মাধ্যমেই ইসলামের শিক্ষা ছড়াতে চেয়েছেন। সে সময় মক্কাবাসীরা তাঁকে কেবল প্রত্যাখ্যানই করেননি, বরং তাঁর সাথে চরম নিষ্ঠুর ও নির্দয় ব্যবহার করেছে, আর তাঁর অনুসারীরা নির্মমভাবে এতোদূর পর্যন্ত নিগৃহীত হয়েছেন যে, ঐশী-নির্দেশের আওতায় পবিত্র নবী (সা.)-কে মক্কা ত্যাগ করে মদিনা শহরে চলে যেতে হয়েছে। যাহোক, হিজরত করার পরও মক্কাবাসীরা মুসলমানদেরকে একাকী থাকতে তো দেয়ই নি, উপরন্তু পূর্ণভাবে সজ্জিত সেনাদল নিয়ে হিজরতকারী মুসলমানদের ওপর চড়াও হয়েছে। সে সময়ই প্রথমবারের মত আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক মুসলমানদেরকে আত্মরক্ষার জন্যে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

যে কারণে এ অনুমতি দান করা হয়, সেটা পবিত্র কুরআনের সূরা আল হজ্জ-এর আয়াত নং ৪০ ও ৪১ এ বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে আল্লাহ্ বলেছেন যে, একটি আত্মরক্ষা-মূলক যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো, কারণ মুসলমানরা যদি নিজেদেরকে রক্ষা না করে, তবে সমগ্র বিশ্বের শান্তিই বিপন্ন হবে। বিরোধীরা কেবল ইসলামকেই মুছে ফেলতে চায়নি, বরং বিশ্ব থেকে সব ধরনের ধর্মই আসলে মুছে ফেলতে চেয়েছে। অতএব পবিত্র কুরআন বর্ণনা করে যে, অনুমতিটি যদি দেয়া না হতো , তবে চার্চ, সন্যাসাশ্রম, গীর্জা, মসজিদ অথবা ইবাদতের জন্য নির্ধারিত অন্য কোন স্থানই নিরাপদ থাকতো না। এমতাবস্থায়, মুসলমানদেরকে কেবল ইসলাম রক্ষা করার জন্যই পাল্টা যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়নি, বরং বর্ণিত আয়াতের ভিত্তিতে সব ধর্মের রক্ষার্থেই যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে।

এ আয়াতের আলোকে আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারেন যে, আজকের এই পোশাকী মুসলমানরা কতই না ভুল পথে আছে, যারা এ দাবী করে যে, অমুসলিমদেরকে হত্যা করা, তাদের ভূমি জবর দখল করা অথবা তাদেরকে দাস বানানো অনুমতিযোগ্য। বাস্তবতা হচ্ছে, ইসলাম হচ্ছে সেই ধর্ম, যা প্রত্যেক মানুষকে স্বাধীনতা ও স্বাধীকার নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার প্রদানের অঙ্গীকার করে। আর ইসলাম হচ্ছে সেই ধর্ম, যেটা প্রত্যেক মানুষকে শান্তি ও সৌহার্দপূর্ণ অধিকারের সুরক্ষা দিয়ে জীবন-যাপনের নিশ্চয়তা দিয়েছে, তা তাদের ধর্মের পটভূমি যা-ই হোক।

ইতোপূর্বেই আমি এটা উল্লেখ করেছি, মহানবী (সা.) কিভাবে তাঁর অনুসারীদেরকে সাথে নিয়ে মদিনায় চলে গিয়েছিলেন এবং কি পদ্ধতিতে মুসলমানরা সেখানকার স্থানীয়-সমাজে নিজেদেরকে খাপ খাইয়েছিলেন, সেটাই ছিলো মক্কা থেকে হিজরত করে এক নূতন সমাজে সংঘবদ্ধ হওয়ার এক খাঁটি আদর্শ। মুসলমানরা পৌঁছার আগে মদিনানগরীতে বসবাস-রত দু'টো দল ছিলো, যারা হলো ইহুদী ও মরুবাসী আরবী। মুসলমানরা উপস্থিত হবার পর সেখানে হয়ে গেলো তিনটি দল–মুসলমান, ইহুদী ও অমুসলিম-আরবীয়। মহানবী (সা.) তাৎক্ষনিকভাবেই উল্লেখ করলেন, এটা জরুরী যে, তারা সবাই শান্তি এবং ঐক্যের সাথে বসবাস করবে এবং এ কারণে তিনি তাদের মধ্যে একটি শান্তি-চুক্তি করার প্রস্তাব করলেন। এই চুক্তির শর্ত মোতাবেক প্রত্যেকটি দল এবং গোত্রকে তাদের প্রাপ্য-

অধিকার দেয়া হয়েছিল। সব দলের মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিলো এবং পূর্ব থেকে চালু যেকোন আন্ত-গোত্রীয় প্রথার প্রতিও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছিলো। এটাও স্বীকৃত হয়েছিলো যে, মক্কা থেকে কোন লোক কোন ক্ষতি অথবা দুষ্কর্ম করার মনোবৃত্তি নিয়ে যদি মদিনায় আসে, তাকে মদিনার কেউ-ই কোন আশ্রয় দিবে না, অথবা তার সাথে কোন চুক্তিতে জড়াবে না।

উপরন্তু, যদি সাধারন এক শত্রু মদিনা আক্রমণ করে, তবে তিনটি দলই সম্মিলিতভাবে শহরটিকে রক্ষা করবে, যদিও এমনটা নির্ধারিত ছিলো যে, মুসলমানরা কখনো আক্রান্ত হলে অথবা মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করলে মুনলমানদের পক্ষে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে অ-মুসলিমদেরকে বাধ্য করা যাবে না। এছাড়াও, অন্যান্য দলের সাথে ইহুদীদের কোন চুক্তি হয়ে থাকলে সে চুক্তিকেও মুসলমানরা মেনে চলবে। ইহুদীরা তাদের নিজ ধর্ম নিয়েই চলবে আর মুসলমানরাও তাদের নিজ ধর্মের অনুসরণ করে চলবে।

এ চুক্তির শর্তগুলো যখন তিনটি দলই মেনে নিলো, তখন সব দলেরই পারস্পরিক সম্মতিতে এটাও স্বীকৃত হলো যে, মহানবী (সা.) হবেন সম্মিলিত এই ব্যবস্থাপনার 'রাষ্ট্রপ্রধান'। তদসত্ত্বেও, যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি, ইহুদীদেরকে ইসলামী-শরীয়ত মানতে বাধ্য করা যাবে না, বরং তাদের থাকবে শুধুমাত্র ইহুদীদের ধর্ম-বিধান ও রীতি পালনের বাধ্য-বাধকতা। এটাই ছিল সেই পারস্পরিক-শ্রদ্ধা, যা ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী (সা.)-এর সহনশীলতা ও পারস্পরিক-শ্রদ্ধার উদাহরণ। এতসব নমুনা থাকা সত্ত্বেও আজ ISIS এ দাবী করে যে, শরীয়া-আইন প্রত্যেক ব্যক্তির ওপরই খাটানো হবে, তা তাদের নিজ ধর্ম-বিধান যা-ই হোক না কেন? সেযুগে মহানবী (সা.) সেই একই চুক্তির আওতায় নারীদের অধিকারও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে স্পষ্টভাবে এটা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল যে, কোন নারীকেই তার বাড়ী থেকে জোর করে বের করে দেয়া অথবা তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিবাহ দেয়া যাবে না। তাহলে ISIS-এর পক্ষ থেকে করা এ দাবী কিভাবে সঠিক হয় যে, অ-মুসলমান মেয়েদেরকে তাদের অধিনস্থ অথবা অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা যাবে? ঐ চুক্তি মোতাবেক কোন মানুষকে কখনোই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা যাবে না, বরং এটাও সরাসরি উল্লেখ আছে যে, মদিনার ইহুদী ও অ-মুসলিমদের সাথে 'মুসলমানদের ভাই' হিসেবে ভালোবাসা ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরন করতে হবে। অতএব, এটাই হচ্ছে সংক্ষেপে সেই চুক্তি, যা মুসলমানরা মদিনায় পৌঁছার পর মদিনায় বসবাসকারী সকল গোত্রকে একতাবদ্ধ করেছিলো।

ইতিহাসও এ সত্যের সাক্ষ্য বহন করে যে, মুসলমানরা এ চুক্তি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। অন্যান্য দলগুলো দ্বারা কখনো চুক্তিটি যদি ভঙ্গ হোত মদিনার স্বীকৃত-নেতা হিসেবে মহানবী (সা.)-কে সেসব ব্যক্তি অথবা দলের সাথে কথা বলতে হোত, যারা চুক্তির খেলাপ অথবা কোন ত্রুটিপূর্ণ কাজে জড়িয়ে পড়তো। কিন্তু এ ধরনের শাস্তিগুলো চুক্তির শর্ত মোতাবেক সুন্দরভাবে দেয়া হোত, এবং কোনরূপ অবিচার হোত না। এভাবে, এটাই হচ্ছে ইসলামী-সরকারের সত্যিকার প্রকাশ, যার ভিত গড়েছেন মহানবী (সা.) আর তাঁকে অনুসরণ করে ৪জন খোলাফায়ে রাশেদীন দ্বারা সেই সরকার পদ্ধতি-ই জারী ছিলো, এবং ইসলামের ১ম শতাব্দী জুড়েই তা কায়েম ছিলো। আর সে কারণে, ISIS অথবা অন্য কোন মুসলিম-সরকার যদি এসব সত্যিকার ন্যায়বিচার ও সাম্যের এসব নীতির বিরুদ্ধে কাজ করে, তবে সেটা করা হবে কেবলই তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত অথবা রাজনৈতিক-স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। এমনকি, যদি তারা ইসলামের নামে এ দাবী করে বসে, তবে সত্য হচ্ছে এটাই যে, ইসলাম অথবা মহানবী (সা.)-এর শিক্ষাগুলোর সাথে তাদের এ হেন কাজের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই।

মহানবী (সা.) এর আবির্ভাবের পূর্বেকার আরবের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, সেটা ছিল এমনই এক সমাজ, যেখানে প্রত্যেকটি গোত্র যুদ্ধ এবং রক্তপাতের মাধ্যমে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিল। তথাপি সেই-একই সমাজে পবিত্র নবী (সা.) এমন এক বিপ্লব সাধন করেছিলেন যে, তাদের মধ্যকার প্রতিটি দলের সাথে তাদের নিজ ঐতিহ্য ও ধর্মীয়-বিশ্বাস মোতাবেক আচরন করা হতো। কেউ যদি এক নিরপেক্ষ ও প্রভাবমুক্ত হয়ে শুধুমাত্র ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়ন করে, তবে সে (পুরুষ অথবা নারী যে-ই হোক না কেন) দেখতে পাবে যে, পবিত্র নবী (সা.)-এর প্রারম্ভিক-যুগের এবং ৪জন খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলের মুসলমানদের ব্যবহার ছিলো একান্তই আপনজন সুলভ। কোন যুদ্ধে তারা কখনোই আক্রমণকারী ছিলেন না, অথবা কখনোই তারা কোন রাজ্য দখল করতে চাননি। যেখানেই তারা ইসলামের শিক্ষা বিস্তার করতে চেয়েছেন, তারা কেবলই এক সম্পূর্ণ-শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে তা করতে চেয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ, চীন এবং দক্ষিন ভারতে ইসলামের বিস্তার লাভ ঘটলেও ইতিহাসের কোথাও এটা উল্লেখ নেই যে, কোন মুসলমান-সেনাদল কখনো সেইসব জাতিকে আক্রমন করেছে, এরপরও সেইসব দেশ এবং অন্যান্য জাতিতে ইসলাম শান্তিপূর্ণ উপায়েই বিস্তার লাভ করেছে। পরবর্তী সময়ে কতিপয় মুসলমান সম্রাট বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে যুদ্ধ শুরু করেছিলো, যার জন্য কেবলই তাদেরকে দোষ দেয়া যায় না। সেসব যুদ্ধে দখলকৃত দেশগুলোতে কখনোই জোর করে ইসলাম গ্রহণ করানো হয়নি। পবিত্র কুরআন অবশ্যই এধরনের বলপ্রয়োগ সম্পূর্নরূপে নিষেধ করে এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে প্রচারের শিক্ষা দান করে।

ইতিপূর্বে যেভাবে বলেছি, আল্লাহ্ যেখানে প্রতিরোধ-মূলক যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছেন, তা সকল ধর্মকে রক্ষা করার জন্য, শুধুমাত্র ইসলামকে রক্ষা করার জন্য নয়। পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ যুদ্ধের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নির্ধারন করেছেন। যেমন:- সূরা আল বাকারা-র ১৯১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের নীতি প্রতিষ্ঠা করে পবিত্র নবী (সা.)-কে কেবল তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতে বলেছেন, যারা তাঁর (সা.) বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিল, তবে তাতে সীমালংঘন অথবা নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করতে নিষেধ করেছেন। কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্ সেইসব লোককে ভালোবাসেন না, যারা অন্যায়কারী।

পুনরায়, সূরা আন নহল-এর ১২৭ নম্বর আয়াতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে কখনোই সীমালংঘন অথবা আইন ভঙ্গ না করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন, যুদ্ধে বিজয় লাভ করলে অপরাধীকে শাস্তি দেয়া যেতেই পারে, তবে সেটা দিতে হবে ঠিক সেই পরিমাণে, যতটুকু অন্যায় করা হয়েছে।

পুনরায়, সূরা আল বাকার-র ১৯৪ নম্বর আয়াতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেছেন, যুদ্ধ চলাকালে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কেবল ততক্ষণই যুদ্ধ করা উচিত, যতক্ষণ নিপীড়ন

বন্ধ না হয়েছে, এবং এরপর পুনরায় ধর্ম প্রচার করা যেতে পারে। এর অর্থ হচ্ছে, অত্যাচারী যদি বিরত হয়, এবং অশান্তি যদি শেষ হয়ে যায়, তবে তাদের বিরুদ্ধে এরপর কোনপ্রকার ঔদ্ধ্যত্ব প্রদর্শন করা যাবে না।

সূরা আল আনফাল-এর আয়াত নম্বর ৬৮-তে আল্লাহ্ বলেছেন যে, একজন নারীকে যুদ্ধে লিপ্ত অবস্থায় পাওয়া ছাড়া অন্য কোনভাবে কোন মেয়াদকাল বন্দী রাখা শোভনীয় নয়, কারন এমনটি করা হলে খোদার ভালোবাসার চাইতে সম্পদ ও ক্ষমতা লাভের প্রতিই অধিক আকর্ষণ থাকা সাব্যস্ত হয়। এর দ্বারা এটাই প্রমানিত হয় যে, যুদ্ধকালীন সময় ছাড়া অন্য সময়ে কাউকে বন্দী হিসাবে রাখা নিষেধ, আর তা সত্ত্বেও আজকাল আমরা দেখতে পাই, তথাকথিত এসব ইসলাম-পন্থীরা অসংখ্য নিরাপরাধ লোককে জোর করে বন্দী করে রাখছে আর অসহায় প্রতিরক্ষা-বিহীন নারীদেরকে রক্ষিতা বানাচ্ছে। পবিত্র কুরআনে সূরা মুহাম্মদ- এর ৫নম্বর আয়াতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেছেন, যুদ্ধবন্দীদেরকে যুদ্ধ শেষ হবার সাথে সাথেই মুক্ত করে দেয়া উচিত, হয় এদেরকে কিছু মুক্তিপনের বিনিময়ে স্বাধীন করে দিতে হবে, অথবা আরো উত্তম যে, দয়াপরবশ হয়ে বা অনুগ্রহভরে তাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে, আর এটা বন্দী নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। প্রাথমিক যুগে, যুদ্ধরত পুরুষদেরকে উৎসাহিত ও সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য নারীরাও যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেতো, আর পরাজিত হলে বন্দী হতো। যাহোক পবিত্র কুরআন ধারাবাহিকভাবে এটা স্পষ্ট করে বলেছে যে, কোন মহিলার সাথে কখনোই কোন নিষ্ঠুর আচরন করা অথবা তাদের অধিকার হরন করা যাবে না।

কোন যুদ্ধ-বন্দীকে মুক্ত করতে অর্থপ্রদানের বিষয়ে সূরা আল নূরের ৩৪ নম্বর আয়াতে পবিত্র কুরআন বর্ণনা করে যে, মুক্তিপণের অর্থ প্রদানে কারো সক্ষমতা না থাকলে তার উচিত কিস্তিতে তা গ্রহণ করে বন্দীকে মুক্ত করে দেয়া। যুদ্ধ-বন্দীদেরকে মুক্ত করা সম্পর্কে এসব আয়াতের বিষয়াদি প্রাথমিক যুগের আলোকে বুঝা উচিত। সে সময় সেই সব ব্যক্তি যারা যুদ্ধ করেছে তারা তাদের নিজ খরচেই যুদ্ধ করেছে এবং নিজস্ব অস্ত্র-শস্ত্র দিয়েই যুদ্ধ করেছে আর সেজন্য তাদের বন্দীদেরকেও মুক্তি দানের জন্য অর্থ গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। যাহোক বর্তমান কালের যুদ্ধগুলোয় সংশ্লিষ্ট সরকারগুলো যুদ্ধের যাবতীয় খরচের জন্য অর্থ-জোগায় এবং সে কারনে যোদ্ধারা ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধে কোন খরচ করে না। সেজন্য যুদ্ধবন্ধীদের সাথে কিভাবে আচরন করতে হবে, সেটা নির্ধারন করার দায়িত্ব হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সরকার অথবা আন্তজার্তিক কোন সংস্থার অতএব এটা এখন কোন ব্যক্তির দায়িত্ব নয়। দীর্ঘস্থায়ী শান্তির কোন প্রচেষ্টায় বন্দী বিনিময় কর্মসূচিগুলো অথবা জাতিগুলোর মধ্যকার অন্যান্য আচরনগুলো নির্ধারন করার দায় সরকার পর্যায়ে গৃহীত হতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে কাউকে বন্দী করার শর্তগুলো এখন আর কার্যকর নেই এবং এরূপ করাটা সম্পূর্ণভাবেই ইসলাম বিরোধী। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ আরো বলেছেন, অন্যদের ধন-সম্পদ অথবা কারো প্রতি তোমাদের ঈর্ষান্বিত বা লোভাতুর দৃষ্টি দেয়া উচিত নয় এবং সমগ্র বিশ্বের শান্তির জন্যে এই একটিই হলো আজকালের সোনালী নীতি। ইসলামের এই একটি নির্দেশই যদি অনুসরন করা হয়, তবে এক মুসলমান কর্তৃক কখনোই অন্যদের ভূ-খণ্ড, সাম্রাজ্য অথবা সম্পদ দখল করার প্রশ্নই ওঠে না। পবিত্র কুরাআনের সূরা ইউনুসের ১০০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, যেহেতু তিনি হচ্ছেন সর্বশক্তিমান তিনি যদি চাইতেন, তবে সমগ্র বিশ্বকেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করাতে পারতেন। তদ্‌সত্ত্বেও আল্লাহ্ মানব জাতিকে তা করতে বাধ্য করেননি এবং পবিত্র নবী (সা.)-কে এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, ইসলামের বানী প্রচারে শক্তি প্রয়োগের অনুমতি নেই বরং ধর্ম হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয় ও বিবেকের একটি বিষয়।

অতএব, এটা সুস্পষ্ট যে, কোন পরিস্থিতিতেই ইসলাম এবং কার্যত: যেকোন ধর্মগ্রহণে জবরদস্তি করা কখনোই অনুমতিযোগ্য নয়। মুসলমানদেরকে অবশ্যই ইসলামের বার্তা প্রচার করতে বলা হয়েছে, কিন্তু সেটাই হচ্ছে সার্বিক কথা। এভাবে সূরা আল কাহ্‌ফ-এর ৩০নম্বর আয়াতে পবিত্র নবী

(সা.)-কে আল্লাহ্ বলেছেন, গোটা বিশ্বকে একথা অবহিত করতে যে তাদের প্রভুর কাছ থেকে এমন একটি সত্য এসেছে যেটা হোল সফলতা ও সমৃদ্ধি লাভের উপায় এবং পৃথিবীবাসী সেটা গ্রহণ অথবা বর্জন করার বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন। এসব কথা শ্রবণ করা এবং গ্রহণ করার বিষয়টি সবার জন্যেই স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। সব মানুষই এসব কথা বিশ্বাস করা বা না করার বিষয়ে স্বাধীন। আর সে কারনে স্বয়ং মহানবী (সা.) যখন ইসলামের বার্তাটি মানুষের কাছে কেবলই পৌঁছানো এবং অন্য কিছু না করার অনুমতি পেয়েছিলেন, তখন কীভাবে আজকের তথাকথিত মুসলিম নেতারা এর বাইরে যায় এবং এ চিন্তা করে যে ইসলামের পবিত্র নবী (সা.)-এর চাইতেও তাদের অধিক ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব অথবা অধিকার থাকতে পারে?

অতএব, পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের ওপর ভিত্তি করে সংক্ষিপ্তাকারে আমি ইসলামের শিক্ষাগুলোর এক সার-সংক্ষেপ তুলে ধরলাম, যেটা প্রমান করে যে, কতিপয় মুসলিম দলের এমন নিষ্ঠুরতাপূর্ণ কর্মকান্ড সম্পূর্ণ ভাবেই ইসলামের পরিপন্থী।

আপনারা হয়তো আশ্চর্য হবেন-এটা যদি ইসলামের শিক্ষাগুলোর বিরোধী হয়, তাইলে কেন তারা এমনটি করছে? এর সংক্ষিপ্ত জবাব হচ্ছে, যেসব আমি আগেই বলেছি, তারা কেবলই তাদের বৈশ্বিক স্বার্থগুলো পূরণ করতে চাচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য আদৌ আধ্যাত্মিক অথবা ধর্মীয় কিছু নয়। ইসলামের নামে নিষ্ঠুরতা ও রক্তপাতের মাধ্যমে তারা বৈশ্বিক আকাঙ্খাগুলো অর্জন করতে চায়।

আমি আবারো বলি, যেকোন আহমদী-মুসলমান অথবা বস্তুত: যে কোন শান্তিকামী মুসলমানই এতে তীব্র-কষ্ট অনুভব করে যে, তাদের পবিত্র ধর্মটিকে কলঙ্কিত এবং বিকৃত করা হচ্ছে। যাহোক সেসব ব্যক্তি, সংস্থা অথবা রাজনীতিকদেরকে আমি একথাই বলি যে, তারা কেবলই চরমপন্থী দলগুলোর একগুঁয়েমির ভিত্তিতেই দাবী করে থাকেন যে, ইসলাম হচ্ছে অস্থিরতার একটি ধর্ম। আমি বিশেষভাবে তাদেরকে এ বিষয়টি বিবেচনা করতে বলবো, এসব দল কীভাবে এমন তহবিল অর্জন করছে যেটা তাদেরকে সন্ত্রাসী-কর্মকান্ড এবং যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহের কাজ এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত চালিয়ে যেতে দিচ্ছে? এ ধরনের উন্নত মানের অস্ত্র-শস্ত্র তারা কীভাবে সংগ্রহ করছে? তাদের কি অস্ত্র-শিল্পের কোন কারখানা আছে? এটা খুবই স্পষ্ট যে, কতিপয় শক্তিধরের সাহায্য ও সমর্থন তারা পাচ্ছে। এটা হতে পারে, তৈল সমৃদ্ধ মুসলিম রাষ্টগুলো থেকে সরাসরি সমর্থন, অথবা এটা হতে পারে, অন্যকোন বৃহৎ শক্তির গোপন সহযোগিতা এর সাথে রয়েছে।

প্রথম যখন ISIS খ্যাতি অর্জন করে, তখন এটা বলা হয়েছিলো যে, তারা জাতীয় সেনাদলের অস্ত্র-শস্ত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এবং কতিপয় অস্ত্রাগার দখল করে নিয়েছে-একথা সত্যও হতে পারে; কিন্তু এটাই তাদের জন্যে পর্যাপ্ত নয় যে, তা দিয়ে তারা এতটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে সমর্থ হবে। একটি নিয়মিত সেনাদলের সরবরাহ-লাইন যদি কেটে দেওয়া হয়, তাহলে তাদের পক্ষে এটা অসম্ভব যে, তারা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যায়। ISIS এর সরবরাহ লাইন অবিরত ভাবেই বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মনে হয়।

এটা বলা হয়েছে যে, এখন তারা এমনকি বিমান-বিধ্বংসী ক্ষেপনাস্ত্র এবং উন্নত মানের অস্ত্র-শস্ত্রেরও মালিক হয়ে গেছে। এ সবই ISIS এর সরবরাহ লাইনের দিকে ইশারা করে। এটাও এক সাধারন জ্ঞানের বিষয় যে, শত-শত মিলিয়ন ডলারের এত বিশাল এক তহবিল তাদের কী করে রয়েছে? এথেকে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, বাহিরের কোন সমর্থনও তাদের সাথে রয়েছে। অনেক কর্মকর্তা, পর্যবেক্ষক এবং মন্তব্যকার খোলাখুলি ভাবেই এ মতটি সমর্থন করেছেন। যেমন-যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উর্ধ্বতন এক প্রতিনিধি মিঃ ডেভিড কোহেন, যিনি সন্ত্রাসবাদ ও অর্থনৈতিক গোয়েন্দা বিষয়ক অধ:স্তন সচিব, জনসমক্ষে তিনি উল্লেখ করেছেন-

"ISIS হচ্ছে– ইতোপূর্বে যতগুলো সন্ত্রাসী দলের মোকাবেলা আমরা করেছি, তাদের মধ্যে সর্ব-বৃহৎ তহবিল প্রাপ্ত।" তিনি বলেন, "প্রতিমাসে তারা কোটি কোটি ডলার খরচ করছে এবং কালোবাজারে প্রতিদিন এক লক্ষ মিলিয়ন ডলারের জ্বালানী তেল বিক্রী করছে"।

একথা আমাদের জিজ্ঞেস করতে হয়, কোথায় এবং কিভাবে এ বিশাল পরিমানের তেল-ভান্ডারে তারা অবিরত প্রবেশোধিকার পাচ্ছে? বিশ্বের অন্যান্য অংশে জ্বালানী তেলের পরিবহন ও বিক্রীর ক্ষেত্রে মাত্রা নির্ধারন করা হয়ে থাকে। তদ্‌সত্ত্বেও যেকোন ভাবেই হোক ISIS সব রকমের নিয়ন্ত্রন এড়াতে এবং কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা ছাড়া এতো অধিক পরিমান জ্বালানী-তেল অর্জন এবং তা বিক্রী করতেও সক্ষম হচ্ছে, যদিও আমরা সবাই এটা জানি যে, এতো অধিক পরিমান তেলের পরিবহন ও বেচা-কেনা গোপন করে রাখা এতটা সহজ নয়। এটাও বলা হয়ে থাকে যে, দান-খয়রাতের মাধ্যমে ISIS নিয়মিত ভাবেই অর্থ পেয়ে থাকে, কিন্তু তথাপি এর অন্যান্য উৎস থেকে আয়ের তুলনায় এটা হচ্ছে এক সামান্য পরিমান অর্থ। এসব দলের তহবিলের যোগান হচ্ছে এক বড় সমস্যা, কারন এসব হচ্ছে সেই তহবিল, যার মাধ্যমে তারা সুবিধাজনক দল ও ব্যক্তিদেরকে তাদের শিকারে পরিণত করতে পারছে। যেমন-সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদন থেকে বর্নিত হয়েছে যে, ISIS-এ যোগদান করতে কোন পরিবার যদি একজন সদস্যকে পাঠায়, তবে সে পরিবারকে প্রারম্ভিক ভাবেই হাজার-হাজার ডলার এবং পরবর্তীতে নিয়মিত ভাবেই শত-শত ডলার দেয়া হয়ে থাকে। এজন্যে, এসব দলকে তহবিল যোগান দেয়ার কাজটি বন্ধ করতে অতিশীঘ্রই কিছু একটা করা জরুরী। পশ্চিমা-জগৎ এখন বিষয়টি অনুধাবন এবং স্বীকার করতে শুরু করেছে যে, এটা হচ্ছে এমনই এক যুদ্ধ, যেটা আসলেই সরাসরিভাবে তাদেরকেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে। যাহোক এ বিষয়টিও বিবেচনাধীন রয়েছে। আসল সত্য এটাই যে, এটা হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধেই এক যুদ্ধ।

নিয়মিত এক বিষয় হিসেবে আমরা দেখতে পাই যে, বৃহৎ শক্তিগুলো মুসলিম দেশগুলোর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত নীতিগুলোকে বলিষ্ঠভাবে প্রভাবিত এমনকি পরিচালিত করতে সক্ষম আর সেজন্য প্রশ্ন হচ্ছে, কেন তারা এ ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব খাটায়নি যেখানে ন্যায়সঙ্গতভাবেই এটা করা অতীব জরুরী? সব ধরনের চরমপন্থা ঠেকাতে কেনইবা সম্মিলিত, যৌথ এবং সমষ্টিগত এক উদ্যোগ নেয়া হয় না? এমনকি বর্তমানে যেসব প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হচ্ছে তা এ দলটির যতটুকু ধ্বংস সাধন করতে পারে, সেটা তুলনামূলক ভাবে খুবই নগণ্য। আমার মতে, যা ঘটেছে তা কেবলমাত্র মুসলিম বিশ্বের ত্রুটি-বিচ্যুতির কারনে নয় বরং কতিপয় বহির্শক্তি এবং সেনাদল রয়েছে, যারা এ ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার পেছনে মদদ দিচ্ছে।

কয়েক বছর ধরেই সিরিয়া এবং ইরাকে

অভ্যন্তরীন সংঘর্ষ চলছে এবং বহির্শক্তিগুলো সেখানে তাদের তহবিল এবং সেনা অথবা সেনা সমর্থিত বিদ্রোহী দল ও উপদল পাঠাচ্ছে, যেগুলোর যোগান দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে সংঘর্ষ বর্তমানে তাদের দাতা-প্রভুদের নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে গেছে। তাদের চরমপন্থী আদর্শগুলোর ভিত্তিতে তারা ত্রাস সৃষ্টি এবং সব ধরনের ভীতি সঞ্চার করে চলেছে। এটা বর্ননা করে আমি এমন কিছু বুঝাতে চাইনা যে, ইতোমধ্যে এ খবর সংবাদ মাধ্যমে খোলাখুলিভাবে জনসাধারনের মধ্যে প্রচারিত হয়নি। ISIS-এর মতো ত্রাস সৃষ্টিকারী যোদ্ধাদল এমনসব নীতিরই উৎপাদিত ফসল এবং সেটা এখন তাদের ভীতির বেড়াজাল বহুদুর পর্যন্ত ছড়িয়ে ফেলেছে এবং সমগ্র বিশ্বকেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

আমি আবারো বলি যে, **আমার জন্য এটা নিদারুন এক ব্যথা ও চিন্তার কারন যে, এ সবগুলো মন্দকর্মই ইসলামের মতো এক পবিত্র ধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হচ্ছে। আজকাল এক বিশাল চিন্তার বিষয় এটা যে, পশ্চিমা দেশগুলো থেকেও মুসলমান যুবকরা সিরিয়া ও ইরাকের মতো দেশগুলোতে যাচ্ছে এবং সেখানে তারা মৌলবাদ তথা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে দীক্ষা নিচ্ছে।**

এটা খুবই সম্ভব যে, তারা কখনো তাদের স্বদেশে ফিরে গিয়ে বিশ্বের সেই অংশেও আক্রমন চালাতে অথবা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। এভাবে এটা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বেশী দিন আর এটা স্থানীয় অথবা শুধুমাত্র মুসলিমদের ঘটনা হিসাবে থাকছে না-এটা হয়ে যাবে একটি আন্তর্জাতিক বিষয়, এসব চরমপন্থী সংস্থাকে থামাতে প্রয়োজন হচ্ছে বৈশ্বিক একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা। কতিপয় স্বনাম-ধন্য ব্যক্তিত্ব এ পরামর্শ দিয়েছেন যে, চরমপন্থীদের সাথে এ যুদ্ধ শেষ করতে ৩০ বা এমনকি ১০০বছরও লেগে যেতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি, এসব সামরিক এবং চরমপন্থী দলকে অনেক স্বল্পতর সময়ের মধ্যেই থামানো যেতে পারে, যদি বিশ্ব তাদেরকে প্রকৃতই নির্মূল করার চিন্তা রাখে। আমরা অবশ্যই মনে করি না যে, এ যুদ্ধ শেষ করতে কয়েক দশক লেগে যেতে পারে একথা বলেই আমরা আমাদের দায়-দায়িত্বগুলো থেকে মুক্ত হয়ে যাবো, বরং বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করতে আমাদের প্রত্যেককেই এর প্রচেষ্টায় যুক্ত হতে হবে।

কেবলমাত্র ইসলাম অথবা কোন বিশেষ দলের গায়ে এ দোষ চাপালেই সেটা আমাদেরকে যুদ্ধ থেকে রক্ষা অথবা আমাদের দায়িত্ব পালনের দায়বোধ থেকে আমাদেরকে ছাড় দেবে না। এভাবে সব দেশের শান্তিকামী মানুষেরই উচিত তাদের সরকারগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করা এবং রাজনীতিবিদ ও অন্যান্য প্রভাবশালী সব ব্যক্তিদের অবশ্যই উচিত এর ওপর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে সত্যিকার ন্যায়-বিচার সমুন্নত করে বিশ্বের শান্তি ধ্বংসের প্রচেষ্টায় পূর্ণভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বিশ্ব-শান্তির উন্নয়ন সাধন করা। আমরা যদি বিশ্বকে রক্ষা করতে চাই, তবে সমাজের প্রত্যেক স্তরে খাঁটি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে এবং যেসব দেশ সন্ত্রাস সংশ্লিষ্ট সেসব সমস্যা মোকাবিলা করছে, এক সুন্দর পদ্ধতিতে সেগুলোর সমাধান হওয়া উচিত, যাতে হতাশা অপসারিত হয়।

কোন দেশেরই সম্পদের ওপর ঈর্ষান্বিত লোভাতুর দৃষ্টি দেয়া উচিত নয়, বরং একে অপরকে সাহায্য করার নীতি নির্ধারণ করা উচিত। কালক্ষেপণ না করে জরুরী ভিত্তিতে বিশ্বকে এটা অনুধাবন করতে হবে যে, এ বিশ্ব সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে গেছে তাই বিশ্বকে অবশ্যই তাঁর দিকে ফিরতে হবে। এমনটি যখন হবে, কেবল তখনই সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এটা ছাড়া শান্তির কোন নিশ্চয়তাই থাকতে পারে না। আরেকটি বিশ্ব-যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিণতির সম্ভাবনা সম্পর্কে ইতোপূর্বে আমি অনেকবারই বলেছি এবং সম্ভবত: সেটা এমন এক সংঘাতের পরই সংঘটিত হবে। বিশ্ব যখন এটা অনুধাবন করতে পারবে যে, কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থ ও আকাঙ্খা এবং কায়েমী স্বার্থগুলো চরিতার্থ করার জন্যে যেসব ন্যায়-নীতি বিবর্জিত পন্থা গ্রহণ করা হয়েছিলো সেগুলোর ফলাফল কতই না ধ্বংসাত্মক ! এমন একটি দুর্বিপাক আসার আগেই আমি এটা আশা করি এবং প্রার্থনা করি যে, বিশ্বের বোধোদয় ঘটুক। আমি আশা করি এবং প্রার্থনা করি যে, বিশ্ব এর সৃষ্টিকর্তাকে সনাক্ত করুক এবং তাঁকে গ্রহণ করতে এগিয়ে আসুক।

এসব কথা বলে আমি আপনাদের কাছ থেকে এখন বিদায় নিচ্ছি। আপনাদের সবাইকে অনেক-অনেক ধন্যবাদ।

ভাষান্তর: **মোহাম্মদ ফজলুর রহমান**
পরিমার্জন: **মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ**


IT ACADEMY

**৩য় তলা, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১**

## আই টি একাডেমীর নতুন কোর্স ওয়েবপেজ ডিজাইন (HTML, CSS, Wordpress)

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর দারুত-তবলীগ কমপ্লেক্সে জামা'তের শিক্ষিত সদস্য/ সদস্যাদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার (আই.টি একাডেমি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ৯ই ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়।

**আমাদের কোর্স সমূহঃ**
1. MS Office with internet
2. Hardware Maintenance and Troubleshooting
3. Web page Design
4. Graphich Design

**আমাদের বিশেষত্বঃ**
১. দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত
২. প্রত্যেকে শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা কম্পিউটার
৩. ন্যুনতম কোর্স ফি
৪. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার
৫. সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা
৬. প্রত্যেক ক্লাশের পূর্বে লেকচার শিট প্রদান
৭. ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা
৮. কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান

**ভর্তির যোগ্যতা ও ফিসঃ**
১. ন্যুনতম এস.এস.সি পাশ,
২. ভর্তি ফি -৭০০.০০ টাকা।

**বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুনঃ**

**সৈয়দ খালেদ হাসান**
প্রশিক্ষক, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭১২৫১২৪৬২
ই-মেইল ঃ itaamjb@gmail.com, khaleditacademy@gmail.com

**মোহাম্মদ সাইদুর রহমান**
কায়েদ, মখোআ ঢাকা
ইনচার্জ, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৯১১ ৫০১৮৩২

# কলমের জিহাদ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-৩১)

*বৌদ্ধ-ধর্মের পরিচিতি ও পর্যালোচনা*

ইসলাম ধর্ম ছাড়াও পৃথিবীতে আরো যে সকল ধর্ম রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান খুবই প্রয়োজন যাতে আন্তঃধর্মীয় শান্তি–সম্প্রীতি এবং পরমত–সহিষ্ণুতার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা সহজতর হতে পারে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে যুক্তি–জ্ঞান এবং নৈতিক দর্শনের আলোকে কতকগুলো বিষয়ে ইসলাম–সহ অন্যান্য ধর্মের তুলনা–মূলক পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

মহান বিশ্ব–স্রষ্টার মহা-পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যেক জাতিতে সৎপথ-প্রদর্শক এবং সতর্ককারী রূপে নবী–রসূল (ভারতীয় পরিভাষায় অবতার) প্রেরিত হয়েছেন যুগে যুগে। ভারতীয় উপমহাদেশে আগমনকারী মহাপুরুষগণের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন রামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ (হিন্দুদের জন্য) এবং গৌতম বুদ্ধ (বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক)। বৌদ্ধ ধর্মের পর্যালোচনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো ঃ (১) বৌদ্ধ ধর্মের গোড়াপত্তন, (২) কলি-যুগে প্রতিশ্রুত সংস্কারক রূপে বুদ্ধের পূণরাগমনের ভবিষ্যদ্বাণীর তাৎপর্য এবং (৩) বর্তমানে প্রচলিত বৌদ্ধ-ধর্মীয় বিশ্বাসের পর্যালোচনা : আহমদীয়া সাহিত্যের আলোকে।

*বৌদ্ধ ধর্মের গোড়াপত্তন*

ভারত-বর্ষের ইতিহাসে বৌদ্ধ ধর্মের গোড়াপত্তনের পট-ভূমি সম্পর্কে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

'World History' By B.V. Rao পুস্তকে বৌদ্ধ-ধর্মের গোড়াপত্তন সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

"Scepticism and religious turmoil infiuenced the course of events during the sixth century B.C. in India. Brahminical Hinduism had lost its hold on the common people mainly due to its insistence on the performance of meaningless rituals and sacrifices, and with its vague spiritual speculations. What a common man needed was a simple pathway to attain salvation. The chaturvarna system became rigid and lacked rationale. The priestly class dominated the scene and, afraid of losing its position, came in the way of the regeneration of Hindu society. The reaction to this priestly-dominated religion came not from the lower classes but from Kshatryas . Gautama the Buddha and Vardhamana Mahavira both belonged to the Kshatriya clan and led the revolt." (page-99)|

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত বর্ণনা থেকে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্যঃ খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ধর্মীয় ক্ষেত্রে চরম বিশৃংখলার জন্য ছিল ব্রাহ্মণ শ্রেণীর আধিপত্য এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে অর্থহীন বাড়াবাড়ি। সাধারণ মানুষের আশা–আকাঙ্খা হিসেবে মুক্তি বা নির্বানলাভের বিষয়টির গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। চতুর্বর্ণ বা জাতিভেদ প্রথা খুবই আনমনীয় পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণ পূরোহিত শ্রেণীর আধিপত্য হিন্দু সমাজের উন্নতির পথে বাধা স্বরূপ ছিল। ব্রাহ্মণ–পূরোহিতের আধিপত্যের বিরুদ্ধে নিম্ন শ্রেণীর কোন পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই। বরং ক্ষত্রিয় শ্রেণীভূক্ত গৌতম বুদ্ধ এবং বর্ধমান মহাবির (জৈন ধর্মের প্রবর্তক)–এর মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছে।

উত্তর ভারতে সিদ্ধার্থ গৌতম নামক রাজ পুত্র মানুষের দুঃখজনক ঘটনাবলীর দ্বারা বিচলিত অবস্থায় সত্যের সন্ধানে রাজত্ব পরিত্যাগ করে আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং আলোক প্রাপ্ত বা 'বুদ্ধ' হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁর জীবন কাল ৫৬০–৪৮০ খৃষ্ট পূর্বে। প্রাথমিকভাবে হিন্দু ধর্মের সংস্কারক হিসেবে পরিচিতি পেলেও কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম পৃথক ধর্ম রূপে প্রচারিত হতে থাকে। বৌদ্ধ-ধর্মের দুটি প্রধান সম্প্রদায় হলোঃ (ক) মহাযান সম্প্রদায় (অর্থঃ মোক্ষ বা মুক্তি লাভের প্রধান বাহন)। বর্তমানে পূর্ব এশিয়া, চীন, জাপান, কোরিয়া এবং ভিয়েতনামে এই সম্প্রদায় রয়েছে।

(খ) হীনযান সম্প্রদায় (অর্থঃ মোক্ষ বা মুক্তি–লাভের জন্য নিম্নতর বাহন)। থিরাভাদা (Theravada) নামেও পরিচিত। দক্ষিণ এশিয়া, শ্রীলঙ্কা, বার্মা, কম্বোডিয়া, লাওস এবং থাইল্যান্ডে এই সম্প্রদায় রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, উত্তর ভারতের বৌদ্ধধর্ম (তিব্বত, মঙ্গেলিয়া এবং হিমালয় অঞ্চলে) অপেক্ষাকৃত স্বল্প–সংখ্যক তৃতীয় সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত।

বর্তমানে প্রচলিত বৌদ্ধ-ধর্মের মূল-বিশ্বাস : "বৌদ্ধ–ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার প্রকৃত নাম গৌতম। সিদ্ধার্থ নামটি পরবর্তীকালে সংযোজিত। গৌতমের জন্মকাল থেকে এমনকি পূর্বাতিপূর্ব জন্মসমূহ থেকে বুদ্ধত্ব লাভ পর্যন্ত তাঁর নাম বোধিসত্ত্ব। পালি সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ সুত্তনিপাতে আছে.

"শ্রেষ্ঠ রত্নের ন্যায় অতুলনীয় যে বোধিসত্ত্ব, তিনি লুম্বিনী জনপদে শাক্যদের গ্রামে মানবের মঙ্গল ও সুখের জন্য জন্মগ্রহণ করিলেন।'

বোধি অর্থ যে-জ্ঞানে মানুষের উদ্ধার হয়। এই জ্ঞানের জন্য যিনি চেষ্টা করেন তাঁকে বোধিসত্ত্ব বলে। জাতককথার মতে তাঁর পূর্বজন্মসমুহের নাম বোধিসত্ত্ব। বৌদ্ধধর্ম পুনর্জন্মবাদ স্বীকার করে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে তিনি গৌতম বুদ্ধ নামে পরিচিত। সব জীবের প্রতি তাঁর মৈত্রী ও করুণা স্বভাবের জন্য তাঁর নাম মহাকারুণিক। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবহিত বলে তাঁর অন্য নাম তথাগত। বুদ্ধ ধর্মকথা বিশ্লেষণের সময় বা কথোপকথনের সময় নিজেকে তথাগত বলে সম্বোধন করতেন। জাতকে তাঁর শাস্তা নামের উল্লেখ আছে। তাঁর বিভিন্ন নাম–সুর্যবংশ, আঙ্গিরস, শাক্যসিংহ, শাক্যমুনি, শাক্য, শৌদ্ধোদনি, আদিত্যবন্ধু, সিদ্ধার্থ সিদ্ধ, গৌতম।" (৩০)

যদিও জন্মান্তরবাদ এবং কর্ম-যোগ ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের মিল রয়েছে তবুও অন্যান্য কতগুলো ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ধর্মের পার্থক্য রয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের মতে জাতিভেদ প্রথা গ্রহণযোগ্য নয়, বেদের শিক্ষা বিকৃতির শিকার হয়েছে এবং ব্রহ্মা বা পরমাত্মার মধ্যে ব্যক্তি আত্মা মিলিত হওয়ার মাধ্যমে মোক্ষ বা মুক্তি লাভের ধারনা সঠিক নয়। মানব জীবন শুধু সুখের জন্য নিবেদিত নয়। মধ্যম পন্থা অবলম্বন করাই সর্বোত্তম। লোভ-লালসা নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে মানুষ তার দুঃখ-কষ্ট জয় করতে সক্ষম। পূর্ণজ্ঞান লাভের মাধ্যমে 'নির্বান' লাভ করা সম্ভব যখন সীমাহীন জন্ম এবং পূণর্জন্মের শৃংখল থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। যে মানুষ নিজেকে জয় করেছে, সে-ই এরূপ বড় যোদ্ধা যে লক্ষ লক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় করে বিজয় অর্জন করে।

আট প্রকার পথ ও পন্থা হলো : (১) সত্য বিশ্বাস (২) সত্য সংকল্প, (৩) সত্য কথা (৪) সত্য ব্যবহার , (৫) সত্য পেশা (৬) সত্য প্রচেষ্টা , (৭) সত্য সাধনা এবং (৮) সত্য মনো–সংযোগ। প্রধানত এগুলো হলো বৌদ্ধ-ধর্মের মূল -শিক্ষা।

"বুদ্ধ যে অষ্টমার্গের উপদেশ দিয়েছিলেন তা মূলত তাঁর সন্ন্যাসী আশ্রম বা সঙ্গ শিষ্যদের জন্য। কিন্তু তিনি তাঁর প্রখর বাস্তব চেতনা দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, সাধারণ আগ্রহী মানুষ কখনোই এই অষ্টমার্গের পথকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করতে পারবে না। তিনি সমগ্র মানব সমাজের জন্য দশটি নীতি প্রচলন করলেনঃ

১.তুমি কোন জীব হত্যা করবে না। ২.অপরের জিনিস চুরি করবে না। ৩. কোন ব্যভিচার বা অনাচার করবে না। ৪. মিথ্যা কথা বলবে না, কাউকে প্রতারণা করবে না। ৫. কোন মাদক দ্রব্য গ্রহণ করবে না। ৬. আহারে সংযমী হবে। দুপুরের পর আহার করবে না। ৭. নৃত্যগীত দেখবে না। ৮. সাজসজ্জা অলঙ্কার পরবে না। ৯. বিলাসবহুল শয্যায় শোবে না। ১০. কোন সোনা বা রূপা গ্রহণ করবে না। এই দশটি উপদেশের মধ্যে প্রথম পাঁচটি ছিল সাধারণ মানুষের জন্য। আর সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে দশটি উপদেশই পালনীয়।"(৩১)।

**বৌদ্ধ ধর্ম–শাস্ত্রঃ**

বৌদ্ধ–ধর্মের পুস্তকের নাম (ক) 'ত্রিপিটক' বা জ্ঞানের তিনটি পাত্র। মহাযান সম্প্রদায় প্রধানতঃ এই পুস্তকের অনুসারী। (খ) পালি–নীতি শাস্ত্রঃ হীনযান সম্প্রদায়ের জন্য। বর্তমান যুগের বৌদ্ধ–ধর্ম স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করে না। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন কারণে মহামতি বুদ্ধের শিক্ষা বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়েছে। ত্রিপিটকের তিনটি খণ্ড রয়েছেঃ সুপ্তপিটক, বিনয়পিটক এবং অভিধম্ম–পিটক। সুপ্তপিটকে লোক প্রচলিত উপদেশ সংকলিত হয়েছে। এর পাঁচটি ভাগ রয়েছে। বিনয়–পিটকে ভিক্ষু–সংঘের নিয়ম–কানুন এবং তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের অবশ্যপালনীয় আচার–ব্যবহার লিপিবদ্ধ আছে। অভিধম্ম পিটকে বৌদ্ধদর্শন এবং তৎকালীন নানা মতবাদ সম্পর্কে সরলভাবে বর্ণিত আছে। (গ) ***জাতকঃ*** বৌদ্ধদের মতে জাতকগুলো গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মবৃত্তান্ত। তিনি শিষ্যদের উপদেশ দেওয়ার সময় অতীত কথা সমূহ শুনিয়ে তাদের নির্বাণপথের অভিমুখী করে তুলতেন। "স্পন্দন জাতক" "দদ্দভ জাতক"(৩২২) "লটুকিক জাতক" "ব্রহ্মধর্ম জাতক" ও "সমোমাদমান জাতক" এই পাচটি জাতক শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে বিরোধ মিটাবার কাজে বলেছিলেন। প্রত্যেক জাতকেই এরকম কোনো না কোনো প্রসঙ্গে কথিত হয়। এসব জাতক পরবর্তীকালে বুদ্ধের শিষ্যরা সংগ্রহ করেন। 'জাতকার্থবর্ণনা' নামক পালি গ্রন্থে জাতক সংখ্যা ৫৪৭। জাতকার্থবর্ণনা কেবল জাতক সংগ্রহ নয়, এতে নিদানকথাকারে অতীতে বুদ্ধগণের, বিশেষত গৌতমবুদ্ধের জীবনবৃত্তান্ত, প্রত্যেক জাতকের উৎপত্তির ইতিবৃত্ত এবং গাথাসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে। সমস্ত জাতক গৌতমবুদ্ধ রচিত বা কথিত বলে মনে হয় না।

*[**নোটঃ** জাতকের আখ্যানগুলোর রচনশৈলীতে পার্থক্য, পুনরুক্তি দোষ এবং গাথাসমূহের ভাষাগত ও কাব্য–গুণগত বিভেদ দেখে মনে হয় জাতকগুলো ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা রচিত হয়েছিল। রামায়ণ ও মহাভারতে জাতকের কাহিনী দেখা যায়। বৃহৎকথায় জাতকের কাহিনী পাওয়া যায়। ঈশপের গল্পের অনেকগুলোই জাতকের রূপান্তর। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ জয় করেন। গ্রীকদের সর্বপ্রাচীন কথা সংগ্রহ আলেকজান্ডাররের মৃত্যুর পর খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০অব্দে সম্পাদিত হয়। বাণিজ্য উপলক্ষে ভারতের সঙ্গে মিশরের সম্পর্ক স্থাপিত হলে লোকের মেলামেশা ও আদান–প্রদান বাড়ে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমকরা ভারতের কাহিনী নিয়ে যায় নিজেদের দেশে। এভাবে অনেক জাতক ও অন্যান্য কথা ইউরোপে চলে যায়। 'মিত্রবিন্দক জাতক' থেকে রচিত হয়েছে অডিসিয়ুসের ভ্রমণবৃত্তান্ত। এছাড়া মিত্রবিন্দকের সঙ্গে সিন্দাবাদেরও সম্পর্ক আছে। 'রাধা জাতক' আরব্য রজনীর কাহিনীতে স্থান পেয়েছে। ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের আগে মধ্যপ্রাচ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ছিল, বৌদ্ধরাই শেষে মুসলমান হয়। কাজেই এখানকার অনেক কাহিনীতে জাতক কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যাবে। আরবদের সংস্পর্শে এসে নিগ্রোরা জাতকের কাহিনী শেখে। দক্ষিণ কারোলিনার নিগ্রোদের রিমাস কাকার কাহিনী 'শ্লেষরোম জাতক'। ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড বিদ্রোহী ভূস্বামীদের ভৎর্সনা করে 'সত্যংকিল জাতকের' আখ্যায়িকা বলেছিলেন। চসার 'বেদান্ত জাতক'

অবলম্বন করে 'পারডোনার্স টেল' রচনা করেন। শেকসপীয়রের মার্চেন্ট অব ভেনিসে আধসের মাংস ও তিন পেটিকার কাহিনীতে জাতকের গল্প লুকিয়ে আছে। গ্রীক ভাইদের কথাকোষে 'দধিবাহন জাতক' প্রভৃতি সতেরো–আঠারটি জাতকের গল্প আছে।"] (৩০)।

**কলি–যুগে বুদ্ধের রূপকভাবে পুনরাগমনের ভবিষ্যদ্বাণীঃ**

কতকগুলো ভবিষ্যদ্বাণী বৌদ্ধ ধর্মের শাস্ত্রমতে পাওয়া যায় বিশেষতঃ কলিযুগে আগমনকারী মহাসংস্কারক সম্পর্কে। যেমন–

(ক) "আমিই এখন সেই মহাবুদ্ধ, কিন্তু আমার পরে মৈত্রেয় আগমন করবেন যখন সুখময় কালাবর্ত সমাপ্ত হবে এবং পুর্ব যুগের কথা প্রবাহিত হবে।" (অনাগত ভবিষ্যৎ)।

উল্লেখ্য যে, মৈত্রের হিসেবে বুদ্ধের পুনরাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী রূপকভাবে দুইবার পূর্ণ হয়েছে, প্রথমে হযরত ঈসা (আ.)–এর মাধ্যমে এবং পরে হযরত ঈসা (আ.)–এর দ্বিতীয় আগমনের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে।

(খ) জাতকঃ "তার লক্ষণ হলো– তিনি মানুষের মধ্যে পুরুষ, সাধু, সৎগুরুপ্রাপ্ত, সন্ন্যাসী জীবন, পূণ্য প্রিয়, অত্যাধিক নম্র অথবা অধিক অগ্নি স্বভাবও নহেন।"

"সকল পূণ্যে তিনি অভিজ্ঞ হবেন। যখন তিনি মানুষের মধ্যে আগমন করবেন, তখন তিনি বোবা, কালা, অন্ধ হবেন না।"

"তিনি নারী নহেন অথবা নারীত্ব ও পুরুষভাবের সমাবেশও নহেন। তিনি নপুংসক শ্রেণীরও নহেন। এই সব লক্ষণ বুদ্ধের জন্য নির্দ্ধারিত।"

(গ) মহাসুপিন জাতকঃ ঐ অনাগত কালের বর্ণনা করতে গিয়ে শাস্তা (অর্থাৎ বুদ্ধ) বলেছেনঃ "তখন রাজাগণ অধার্মিক হবে, মানুষ অসৎ পথে বিচরণ করবে, জগতের অধোগতি হবে, অনাবৃষ্টি দেখা দিবে, ফলে দুর্ভিক্ষ হবে, লোকেরা স্বল্পায়ু হবে, বয়োজ্যেষ্ঠ দেরকে সম্মান করা হবে না, পিতা–মাতাকে উপেক্ষা করা হবে, উৎকোচ গ্রহণ বৃদ্ধি পাবে, অধার্মিক ভিক্ষুদের প্রাধান্য হবে" ইত্যাদি। শেষ–যুগের আগমনকারী বুদ্ধের নাম 'এমদ' হবে (জৈনঠাপকাত্তানি নামক গ্রন্থ)। (২৭)

(ঘ) দিঘা নিকায়া ৩ঃ৭৬ চাক্কাবত্তি সিহানাদা সুত্তানতাঃ

"সেই দিনগুলোতে, হে ভাতৃগণ, পৃথিবীতে একজন মহামানবের আবির্ভাব ঘটবে যার নাম 'মৈত্রেয়া'। তিনি হবেন আরাহন্ত' পূর্ণভাবে জাগ্রত, তাঁর মধ্যে থাকবে মহাজ্ঞান এবং সাধুতা, সুখ–শান্তি এবং পৃথিবীর জ্ঞান–সমুহের ভান্ডার, মানব–জাতির জন্য অদম্য পথপ্রদর্শক –তাদের জন্য যারা তাকে মান্য করতে চাইবে। দেবতা এবং মানুষের জন্য শিক্ষাগুরু মহিমান্বিত মহাপুরুষ, বুদ্ধ–তূল্য–যেমন এখন আমি এসেছি। সেই ধর্মীয় অনুশাসন যার শুরুটা মনোরম এবং যার পূর্ণতাও মনোরম তা প্রচারিত হবে–শাব্দিক অর্থে এবং অন্তর্নিহিত সত্য রূপে। তিনি উচ্চতর জীবনের সন্ধান দিবেন–পরিপূর্ণরূপে এবং বিশুদ্ধতার আলোকে– যেমন আমি এখন সম্পাদন করছি। তাঁর সঙ্গে থাকবে হাজার হাজার ভাইগণের দল সমূহ যেমন এখন আমার সঙ্গে শত শত ভাইদের দল রয়েছে।"

(ঙ) এনসাইক্লো–পেডিয়া ব্রিটানিকা– 'মৈত্রেয়' শব্দের অর্থ প্রসঙ্গেঃ "মৈত্রেয়ার আবির্ভাব ঘটবে পৃথিবীতে যিনি একটি নতুন ধর্ম (ধর্ম–বিধি) প্রচার করবেন সেই সময় যখন বুদ্ধের মূল শিক্ষা সমূহ পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হবে।"

(চ) মৈত্রেয়ার সুমহান কার্যাবলী সম্পর্কিত সুত্রাবলীঃ

"আগমনকারী মহাপুরুষ দীর্ঘকালীন প্রচার কালে মৈত্রিয়া তাঁর মহান শিক্ষাসমূহের চাকা তিনবার ঘুরাবেন এবং প্রত্যেকবারই অগণিত জনতা তাঁর বক্তব্য শ্রবণের জন্য সমবেত হবে। মৈত্রিয়া মহামানবদের চারটি সত্যবাণী শিক্ষা দিবেন যার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ শিষ্য প্রকৃত মুক্তির সন্ধান লাভ করবে। সমবেত জনগণের মধ্য থেকে অনেকেই 'আরাহত' এবং বুধিসত্তা এবং এমনকি পূর্ণভাবে আলোকিত বুদ্ধগণের পদমর্যাদা লাভ করতে সমর্থ হবে। তাঁর পবিত্র দেহের শক্তির মাধ্যমে তাঁর বক্তৃতা এবং মানসিক শক্তির দ্বারা মৈত্রেয়া পরিচালিত করবেন এবং সমবেত জন–গণের আকাংখা পুরণ করবেন তাদের ব্যক্তিগত চাহিদা এবং গ্রহণ–শক্তির মাত্রানুযায়ী। এইভাবে তিনি অগনিত শিষ্যদেরকে তিনটি বাহনের মধ্য দিয়ে আলোকিত পথ ও মুক্তি–লাভের আহ্বান জানাবেন। যখন তিনি মহামূল্যবান বিধি–বিধান শিক্ষা দিবেন, তখন লোকজন পরিপূর্ণ প্রশান্তি এবং সন্তুষ্টি অর্জন করবে–ঠিক তেমনিভাবে যেমন পিপাসার্ত ব্যক্তি আসমান থেকে নিপতিত মিষ্টি পানি পান করে তার তৃষ্ণা নিবারণ করে। এবং প্রত্যেকেই সংগ্রাম–পূর্ণ জীবন থেকে মুক্তি লাভের পথ অর্জন করবে।" [The Ahmadiyya Gazzette,USA March 2002]

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.)–এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা 'এমদ' তথা 'আহমদ' নামের উল্লেখ, মৈত্রেয় অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী মিত্রতা স্থাপনকারী হওয়ার গৌরব অর্জন, বর্তমান যুগের নৈতিক অবস্থাবলীর সাক্ষ্য এই সকল বিষয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে যে মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গৌতম বুদ্ধের আগমন ঘটেছিল সেই উদ্দেশ্যকে বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণ করার জন্য বর্তমান যুগই উপযুক্ত সময় এবং 'প্রতিশ্রুত মৈত্রেয়' রূপেই আগমন করেছেন আহমদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। মৈত্রেয়া হিসাবে বুদ্ধের পুণরাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী রূপকভাবে দুইবার পূর্ণ হয়েছেঃ হযরত ঈসা (আ.)–এর মাধ্যমে এবং পরে তাঁর দ্বিতীয় আগমনের মাধ্যমে।

(চলবে)


## পাক্ষিক 'আহমদী' পত্রিকায় আপনিও লিখুন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের মুখপত্র পাক্ষিক আহমদী নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এতে আপনিও ধর্মীয় গবেষণামূলক প্রবন্ধ, ইসলামী দর্শন বিষয়ক নিবন্ধসহ তথ্য সমৃদ্ধ বিজ্ঞান বিষয়ক, লেখা-পড়া ও ভ্রমণ সংক্রান্ত লেখা পাঠাতে পারেন।

লেখা অবশ্যই স্পষ্ট হতে হবে এবং ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠে লিখে পাঠাতে হবে। ই-মেইলেও লেখা পাঠাতে পারেন।

**লেখা পাঠানোর ঠিকানা :**

সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১
মোবাইল : ০১৭১৬-২৫৩২১৬
ই-মেইল: pakkhik_ahmadi@yahoo.com, masumon83@yahoo.com

# ইহজগতে জান্নাতের প্রতিচ্ছবি নেযামে ওসিয়্যত ও খেলাফত

মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্

ভূ-পৃষ্ঠে আল জান্নাতের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছিল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শুভাগমনে। ধরাপৃষ্ঠে মহানবী (সা.)-এর আগমনকে রূপকভাবে 'মহান আল্লাহ্ তা'লার আবির্ভাব' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। তিনি (সা.) ***রূহ-উল-আমিন*** এর আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হয়েছেন। নিরাপত্তা লাভের এ এক এমনি মহান স্তর, যা মানুষের কল্পনাতীত এক অবস্থান, যেখানে মহান স্রষ্টার সাথে বান্দার পরম ও চরম নৈকট্য প্রাপ্তি ঘটে। তৌহীদি সত্ত্বার সাথে বান্দার এটি এমন এক নিবিড়-সম্পর্ক, যাকে পবিত্র কালাম কুরআন করীমে ***দানা-ফা-তা-দাল্লাহ-ফাকানা ক্বাবা ক্বাওসাইনে আও আদনা*** (৫৩ : ৯-১০) অর্থাৎ সে (আল্লাহ্‌র) নিকটবর্তী হলো, তখন তিনিও (আল্লাহ্) নিচে নেমে এলেন, এরপর সে দুই ধনুকের এক তন্ত্রী হয়ে গেল অথবা এর চেয়েও নিকবর্তী বলে নিরূপন করা হয়েছে। এ আয়াত সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ করছে যে মহানবী (সা.) এর মাঝে মহান আল্লাহ্ তা'লার ঐশী গুনাবলীর পরিপূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি (সা.) ***" আল-আবদ"*** (৭২:২০)-ও ছিলেন। পবিত্র কুরআন তাঁকে ***"আব্দুল্লাহ"*** আল্লাহ্‌র বান্দা খেতাবেও ভূষিত করেছে, যার ফলে তিনি মানব জাতির জন্য সর্বকালে অনুকরণীয় সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শের মর্যাদা লাভ করেছেন।

আখেরী জামানায় মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি অশেষ করুণা করে তার (সা.) এক অনুগত দাস ***গোলাম আহমদ***-কে প্রেরণ করেছেন। প্রেরীত এই প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-কে সম্বোধন করে এক ইলহামে আল্লাহ তা'লা বলেছেন ***" ইন্নি আনযালতু মা আকা আল জান্না"*** অর্থাৎ "তোমাকে প্রেরণ করার মধ্য দিয়ে আমি জান্নাতের অবতরণ ঘটালাম"।

যদিও মানব জাতির মাঝে আল্লাহ তা'লার মহান রসূলের অবস্থান জগতকে জান্নাতেরই রূপ দান করে, তবে এখানে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কে সম্বোধীত এই ইলহামে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মসীহ মাওউদ (আ.) এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ তা'লা এমন এক বৈপ্লবিক ব্যবস্থাপনা জারী করবেন, যা মানব জাতীকে বংশ পরম্পরায় জান্নাতের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে, আর এর ফলে আল্লাহ তা'লার পবিত্র সান্নিধ্য প্রাপ্তির কারণে তারা প্রশান্তি লাভে পরিতৃপ্ত হতে থাকবে।

সেই বৈপ্লবিক ব্যবস্থাপনার দু'টো উপাদান- **১. *আল-ওসিয়্যত*** ও **২. *খিলাফত***।

আল ওসিয়্যত সেই সমস্ত ব্যবহারিক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত, যা মানবকে হেদায়াতের পথে বিরামহীন সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা, আত্ম-ত্যাগ আর কুরবাণীর জন্য প্রতিনিয়ত অগ্রপানে ধাবিত করে চলে। আর পরিনামে তারা কল্যাণময় খিলাফতের পুরস্কারে অভিসিক্ত হয়। খিলাফত-একতা ও ভ্রাতৃত্ব , তৌহীদের প্রতি বিশ্বাসের গভীরতা বৃদ্ধি আর আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের অভিযাত্রায় কল্যাণমন্ডিত পাথেয়।

এভাবে আল-ওসিয়্যত ও খিলাফত পরস্পর নির্ভরশীল আর এদের যুগপৎ অবস্থান যৌথভাবে মানব জাতিকে ***'আল-জান্নাত'*** এর নিরাপদ ও প্রশান্তিময় পুরস্কার দিয়ে জগতকে শান্তি ও স্বস্তির রহমতপূর্ণ ছায়ায় ঢেকে রাখে।

আল-ওসিয়্যতের ব্যবস্থাপনা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ১৯০৫ ঈসাব্দে জারী করেন আর ১৯০৮ ঈসাব্দে তাঁর পরকাল যাত্রার পর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া খিলাফতের এই আশিষ জগত বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত টিকে থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) মুসলিম উম্মাহকে অধ:পতিত অবস্থা থেকে উন্নীত করে আধ্যাত্মিকতার আলোকে সমুজ্জল এমন এক উম্মতের উদ্ভব ঘটাতে আর্বিভূত হয়েছেন, যারা তাদের সংগ্রাম-মুখর প্রচেষ্টা ও কুরবানীতে আর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর দোয়ার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লার এমনই আশিষ লাভ করেছেন যে, আধ্যাত্মিক পরিভ্রমণের এই পথের অভিযাত্রীরা ক্রমান্বয়ে উন্নীত হয়ে চলছেন।

আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভে প্রত্যাশী এই অভিযাত্রীরা ***কাফূর*** জৈবিক ইন্দ্রিয়াশক্তির উগ্রতা হ্রাসকারী কর্পুর মিশ্রিত শরবত (৭৬:৬), ***তাফজীর*** আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা ও ঐশী উপলব্ধির প্রস্রবন ধারার পানীয় (৭৬:৭), ***যানজাবীল*** আত্মাকে ঐশী সৌন্দর্য ও মহিমা বিকাশে উদ্দীপ্তকারী আদা মিশ্রিত শরবত (৭৬:১৮) ও ***সালসাবীল*** আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছার সরল ও সংক্ষিপ্ত পথ অন্বেষণ পিপাসা নিবারণের শুধা (৭৬:১৯) পান করে আধ্যাত্মিক উর্ধাগমনের অনন্ত পথে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলছেন। এমনকি তারা ***রূহুল কুদুস***-এর অভয়বাণী ***ফীহে-মীন-রূহেনা*** (৬৬:১৩) মরিয়ম সদৃশ সাধু মু'মিনের অন্তরে রূহ ফুঁকে দেওয়ায় মরিয়মপুত্র ঈসা (আ.) এর মত পবিত্র গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার কারণে ***ওয়াস্ সাবিকুনাস্ সাবিকুন*** (৫৬:১১) একটি দল হবে সবার চেয়ে অগ্রগামী, যারা সবাইকে অতিক্রম করে ***উলায়েকাল মুকাররাবুন***-তারা আল্লাহ্‌রই নৈকট্য প্রাপ্ত হবেন, আর এসব বৈশিষ্ট্য লাভ করায় তাদেরকে সম্বোধিত করা হবে ***'ইয়া আইয়াতুহান্ নাফসুন মুতমাইন্নাত'*** (৮৯:২৮) হে শান্তি প্রাপ্ত আত্মা বলে।

পবিত্র কুরআনে সেইসব মুমিনদেরকে খিলাফতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যারা সুদৃঢ় ইমানের অধিকারী এবং সৎকর্মশীল

(২৪:৫৬)। এর থেকে প্রতীয়মান হয় মুমিনদের মধ্যেকার সেই তাকওয়া-পরায়ণ অংশ, যারা সৎকর্মশীল আর বিশ্বাসের উন্নততম মানের অধিকারী, খিলাফতের আশিষে অনুগৃহীত হবে তারাই, যাদের কল্যাণে ও সেবায় অবশিষ্ট মানবজাতি উপকৃত হবে এবং মুমেনদের অন্তর্বলয়ে অবস্থানকারী তাকওয়াপরায়ণ এই সৎকর্মশীল স্বল্প সংখ্যক মুমেনরাই খেলাফতের ধারাবাহিকতাকে নিশ্চিত করবে।

আল ওসিয়্যতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ:) এমনই একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। মসীহ মাওউদ (আ:) এই আকাংখা ব্যক্ত করেছেন যে, তাকওয়াপরায়ণ সেই মুমিন লোকগুলির জামা'ত যাদেরকে ***" কুন্‌তুম খায়রা উম্মাতিন"*** (৩:১১১) অর্থাৎ আহমদীদের অধিকাংশই হলেন তারা, যারা মানব জাতির কল্যাণার্থে উত্তম, এমন লোকগুলোর উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। অতএব, আহমদীগণ তাদের কুরবাণীতে, সততা ও বিশ্বস্ততায় অর্থাৎ কর্মনিষ্ঠায় অন্যান্য লোকদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হবেন।

পবিত্র কুরআন আল ওসিয়্যতের এই ব্যবস্থাপনাটিকে পরিস্কার ভাষায় তুলে ধরেছে " জান্নাতের (প্রতিশ্রুতির) বিনিময়ে নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও তাদের ধন-সম্পদ কিনে নিয়েছেন" (৯:১১১)। এই আয়াতের নির্দেশনাটিকে পবিত্র কুরআনেরই অপর একটি সূরার অন্য এক আয়াতে আরও সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে "তোমরা যা কিছু ভালবাস তা থেকে (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো প্রকৃত-পূণ্য অর্জন করতে পারবেনা। আর তোমরা যা-ই খরচ কর, আল্লাহ্ নিশ্চয় সেই বিষয়ে পুরোপুরি অবগত (৩:৯৩)। এই আয়াতে আমলে সালেহার মর্যাদা তুলে ধরতে ***'আল-বিররা'*** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা উৎকৃষ্টতা আর সঠিকতার এক উচ্চমান নির্দেশ করে, অর্থাৎ তৌহিদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মান-মর্যাদা আর পরিমাপের দিক থেকেও আমাদের প্রচেষ্টা ও কুরবানীকে এক সুউচ্চ মিনারে উন্নীত করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে অর্থাৎ এমন কিছু যা আমরা সবচেয়ে ভালবাসি, আল্লাহ্ তা'লাকে লাভ করার জন্য আমাদেরকে তা অবশ্যই কুরবাণী করতে হবে। এই আয়াতের মর্মানুযায়ী আল-ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনা একজন মানুষের আমলে সালেহার প্রতি অঙ্গীকার পূরণ আর কুরবাণীর ক্ষেত্রে তার গুনগত অবস্থান তুলে ধরে।

আল-ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনা হলো সেই ব্যবস্থাপনা, যার হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে পুরস্কারের মান নিরূপিত হবে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে ***"আল-শাকিরিন"*** (৩:১৪৫)-এ বলা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন করীমে আরও বলা হয়েছে ***" ওয়া ইযাল জান্নাতু উযলেফাত"***-জান্নাতকে যখন নিকটবর্তী করে দেয়া হবে (৮১:১৪) অর্থাৎ যেহেতু শেষ-যুগে মানুষ সাধারণভাবে পাপের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবে এবং ধন-সম্পদ ও ভোগবিলাসিতায় মত্ত হয়ে উঠবে, তখন যে অল্প-সংখ্যক লোক সৎপথে থেকে সরল প্রাণে ধর্ম-কর্ম করতে থাকবে, তারা পুরস্কৃত হবে এবং বেহেশ্‌ত লাভের যোগ্য বিবেচিত হবে। হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী আল মুসলেহ মাওউদ (রা.) ১৯৩২ ঈসাব্দে প্রদত্ত খুতবায় এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-" আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি এ এক মহান অনুগ্রহ দান করেছেন যে, জান্নাত এখন আমাদের হাতের নাগালে, আর আল-ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনা হচ্ছে সেই পথ, যা অবলম্বনে আমরা তথায় পৌঁছতে পারি"।

আল-ওসিয়্যত প্রসঙ্গে হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) জামা'তকে সম্বোধন করে ধারাবাহিক খুতবা প্রদান করেছেন। আর সেই সব খুতবায় নামায ও ইবাদতে এবং আর্থিক কুরবাণীতে জামা'তের সদস্যদেরকে আল-ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে গুনগত ও সমষ্টিগত উন্নতি অর্জন করায় তাগিদ দিয়েছেন। হুযূর (আই.) বলেন-" হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) মানবের মঙ্গল সাধনে আর সার্বিক অগ্রগতি ও উন্নয়নের দিক-নির্দেশ করে শুভ পরিণাম লাভের সর্বাধিক কার্যকরী ও সুক্ষ্ম যে পথ দেখিয়েছেন, তা হলো "নেযামে-ওসিয়্যত"। অতএব নিবেদিত প্রাণে এই ব্যবস্থাপনায় অংশ নিয়ে এর সাথে গভীরভাবে আমাদের সম্পৃক্ত ও সংবদ্ধ থাকা উচিত, যাতে আমরা আমাদের শেষ সময়ে আল্লাহ্ তা'লার সেই বাণী শোনার সৌভাগ্য লাভ করি-***"ফাদখুলি ফী ইবাদী, ওয়াদখুলি জান্নাতি"*** অর্থাৎ "অতএব তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর" (৮৯:৩০,৩১)।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আরও বলেন,

"খোদা তা'লার নৈকট্য লাভের মাঠ বিরান পরে আছে। সব জাতিই সংসার প্রেমে মত্ত। খোদা যাতে সন্তুষ্ট হোন, সেদিকে জগদ্বাসীর কোন ভ্রুক্ষেপই নেই। তোমাদের জন্য সুসংবাদ- পূর্ণ উদ্যমে নিজেদের সদ্‌গুণের পরিচয় দিয়ে এই দ্বারে যারা প্রবেশ করতে চাও, তাদের জন্য খোদার কাছ থেকে পুরস্কার লাভের এটাই সুযোগ।" ('আল-ওসিয়্যত' পুস্তক)।

আল ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনাই ঐশী খেলাফতকে ধারণ করে আর এই খেলাফতের মাধ্যমে মানব জাতির একতা বজায় থাকে আর সুদৃঢ় হয়। আর প্রকারান্তরে তা আমাদের নিজেদেরকে একতার বন্ধনে আবদ্ধ করে আল্লাহ্ তা'লার একত্বের বিকাশ ঘটায়, আর জগৎসমক্ষে তৌহিদী-সত্ত্বার বিকাশ ঘটিয়ে তা সাব্যস্ত করে। খিলাফত হলো সেই চুম্বক, যা আল্লাহ্ তাআলার দয়া ও করুণাকে আকর্ষণ করে। খেলাফতই হলো আল্লাহ্‌র রজ্জু, খেলাফতই হলো আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের ঐশী-পথ, খেলাফতই হলো ঐশী-প্রতিশ্রুতি পূর্ণতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন, খেলাফতই হলো আত্মরক্ষার ঐশী ব্যবস্থাপনা, খেলাফত হলো শান্তি ও নিরাপত্তার বলয়, খেলাফত হলো মহান পুরস্কার-***" আজরান আযীম"*** (৪৮:৩০), আর এরই জন্য খেলাফতই হলো জান্নাত।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর সেই দোয়ার ফল ভোগকারী হলাম আমরা। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ আমাদেরকে আল-ওসিয়্যতের সেই পথে পরিচালিত করেছে। অতএব আমাদেরকে সেই উচ্চ-মর্যাদায় অবস্থান নিতে অনুপ্রানিত হতে হবে আর সেই সাধনায় ব্রতী হতে হবে যাতে বলা হয়েছে– ***"ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্ ইয়াইয়া ওয়া মামাতী লিল্লাহে রাব্বিল আ'লামীন"***– নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার বাঁচা ও মরা, সবই বিশ্ব-জগতের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহর জন্য (৬:১৬৩)।

অতএব আসুন, নেযামে ওসীয়্যতে শামিল হয়ে আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত ঐশী নেয়ামত খেলাফতের এই রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে আমরা আহমদীয়া খেলাফতের পঞ্চম খলিফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:)-এর সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষায় নিজেদেরকে পরিপূর্ণভাবে তাঁর সমীপে সমর্পণ করে ইহজীবনেই জান্নাতের স্বাদ পেয়ে ধন্য হই। আল্লাহ্ আমাদের এই একাগ্র বাসনাকে পূর্ণতা দান করুন, আমীন।

# শবে বরাত
## ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে আদৌ কোন গুরুত্ব রাখে কী?

**আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ

আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইরান, ভারত ও বাংলাদেশে 'শবে বরাত' অত্যন্ত জমকালোভাবে পালন করা হয়। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হলো সউদি আরবে 'শবে বরাত' বলতে কোন অনুষ্ঠান উদযাপন করা হয় না। ১৫ই শাবান হলো 'শবে বরাতে'র দিন ও রাত হলো শবে বরাত। এ-রাত সর্ম্পকে বলা হয়, এ রাতে প্রত্যেক মানুষের ভাগ্য লিখে দেয়া হয়। তাই এ রাতে অনেক বেশী নামায পড়ে খোদাকে সন্তুষ্ট করতে হয়। এছাড়া বলা হয়, ১৫ই শাবান রসূল করীম (সা.) রোযা রাখতেন এবং রাতে কবর যিয়ারত করতেন ও বেশী নওয়াফেল পড়তেন। তাই দিনে রোযা রাখতে হবে এবং রাতে নওয়াফেল পড়তে হবে এবং কবর যিয়ারত করতে হবে। বলা হয়, এ রাতে মৃত-আত্মারা পৃথিবীতে ফিরে আসে এবং তাদের আত্মীয়স্বজনদেরকে দেখে যায়। অনেকে বলেন, জান্নাতে একটি গাছ আছে, যার পাতাগুলোতে পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের নাম লেখা আছে। যে পাতাগুলো এ রাতে পড়ে যায়, সে পাতাতে যে-সব মানুষের নাম লেখা থাকে, তারা এ-বছর মারা যাবে। অনেকের মতে এ রাতে মানুষের জীবন ও মৃত্যু সর্ম্পকে সিদ্ধান্ত হয়। বলা হয়, এ রাতে আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীতে নেমে আসেন এবং বলেন, কে আছে যে, ক্ষমা চাইবে আর আমি ক্ষমা করবো। কে আছে, যে চাইবে আর আমি তাকে দিব।

শবে বরাতে হালুয়া-রুটি বানানো হয় এবং আতশবাজী পোড়ানো হয়। এ নিয়ে মুসলিম উম্মতে অনেক মতভেধ আছে। অধিকাংশের মতে এটি বিদা'ত ও কুরআন ও সুন্নাতে এর কোন ভিত্তি নেই। যারা শবে বরাত উদযাপন করে, তাদের মতে কুরআনে এর দলীল আছে। আর তা হলো সূরা দুখানের চার, পাঁচ ও ছয় নম্বর আয়াতে যেখানে বলা হয়েছে- "আমরা একে নিশ্চয় এক আশিষপূর্ণ রাতে অবতীর্ণ করেছি। আমরা (বিপথগামীদের) সর্তক করে থাকি। আমাদের পক্ষ থেকে আদেশক্রমে (এ রাতে) প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। নিশ্চয় আমরাই রসূল প্রেরণ করে থাকি।"

তাছাড়া, তারা কিছু হাদীসও উপস্থাপন করে থাকেন। প্রায় চৌদ্দটি রেওয়ায়াত শবে বরাতের পক্ষে উপস্থাপন করা হয়। কিছু লোকদের মতে, দ্বিতীয় হিজরীতে কিবলার পরিবর্তন হয়। আর সে দিনটি ছিল ১৫ই শাবান। এজন্য এ-দিনটি উদযাপন করা হয়। আজকাল আলেমগণ শবে বরাতকে সূরা দুখানের আয়াতে বর্ণিত "লায়লাতুন মুবারাকাতুন" বলে থাকে।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে পর্যালোচনা করলে এ রাতের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। আর এ-রাত সর্ম্পকে যে ধ্যান-ধারনা অনেক মুসলমানদের মধ্যে রয়েছে, এর কোন প্রমাণ কুরআন, সুন্নাহ ও হাদীসে পাওয়া যায় না। হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর যুগে তো নয়ই, বরং তাবেঈনদের যুগেও এর কোন নামগন্ধ পাওয়া যায় না। শবে বরাত ইরান থেকে অন্যান্য দেশে ছড়িয়েছে। 'শবে বরাত' ফার্সি শব্দটিও এদিকে সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে। আসলে 'লায়লাতুল কদর' এর ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করলে শবে বরাত হয়। ইসলামী ক্যালেন্ডারে শাবান হচ্ছে অষ্টম মাস। এ মাসের ১৫ তারিখ, অর্থাৎ ১৫ ই শাবান 'শবে বরাত' বলে পরিচিত। আরবে 'লায়লাতুন নিস্‌ফে মিন শাবানা' অর্থাৎ 'শাবান মাসের অর্ধেক' বলে পরিচিত।

'শব' ফারসি শব্দ। এর অর্থ হলো রাত এবং বরাতও ফার্সি শব্দ। এর অর্থ হলো ভাগ্য। এ শব্দটি কুরআন ও হাদীসের কোথাও ব্যবহার হয় নি। তবে এর বিপরীতে সূরা 'কদর' এ "লায়লাতুল কাদর" শব্দ পাওয়া যায়, যা রমযানের সাথে সম্পৃক্ত, শাবান মাসের সাথে নয়।

সূরা 'দুখানে'র যে-আয়াতটি শবে বরাত সর্ম্পকে দলীলরূপে উপস্থাপন করা হয়, তা সম্পূর্ণরূপে এক ভুল ব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তিকর সূরা দুখানের এ-আয়াতে বলা হয়েছে– "ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিম মুবারাকাতিন, ইন্না কুন্না মুনযিরিন অর্থাৎ আমরা একে নিশ্চয় এ আশীষপূর্ণ রাতে অবতীর্ণ করেছি। এখানে 'হু' অর্থাৎ 'একে' সর্বনামটি কারজন্য ব্যবহার করা হয়েছে, তা নির্ণয় করতে হবে। সব মুফাস্‌সিরগণ এ সর্বনামটিকে কুরআনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে বলে একমত। এখন প্রশ্ন হলো, কুরআন কবে অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়েছে? শাবান মাসে না রমযানে? পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলে দিয়েছেন, রমযান হচ্ছে সেই মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। (সূরা বাকারা :১৮৫)

অতএব পবিত্র কুরআন রমযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। উম্মতে মোহাম্মাদীয়া একমত যে, কুরআন রমযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে "লায়লাতুন মুবারাকা" শাবান মাসের নয়, 'রমযান মাসের রাত'– বলে আল্লাহ্ তা'লা নির্ণয় করছেন। যাদের মতে "লায়লাতুন মুবারাকা" শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাত, তারাও এ কথাটি মানেন যে, কুরআন রমযান

মাসে অবতীর্ণ হয়েছে। তাহলে প্রশ্ন করাই যেতে পারে এমন ভুল ব্যাখ্যা করে তারা মুসলমানদের কেন বিদাতের দিকে ঠেলে দিল? এর উত্তর আমরা এছাড়া আর কি দিতে পারি কারণ, হালুয়া রুটির সম্পর্ক সূরা দুখানের এ আয়াতের সাথে নেই। সূরা দুখানের আয়াতগুলিতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, এ রাতে প্রতিটি বিষয়ের বিজ্ঞতাপূর্ণ ও দৃঢ় সিদ্ধান্ত আল্লাহ্‌র নির্দেশে প্রকাশ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত ইবনে ওমর (রা.) , মুজাহিদ, কাতাদা ও হাসান বসরীর মতো প্রখ্যাত তাফসীরকারকগণ "লায়লাতুন মুবারাকা" বলতে "লায়লাতুল কদর"-কে আখ্যায়িত করেছেন। সূরা 'কাদর' পড়লে এ বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে যায়। আল্লাহ তা'লা বলছেন

"নিশ্চয় আমরা এ কুরআন কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি। আর তোমাকে কিসে বুঝাবে যে কদরের রাত কী? কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এতে ফিরিস্তারা এং পবিত্রত্মা সব-বিষয়ে তাদের প্রভু-প্রতিপালকের আদেশ নিয়ে অবতীর্ণ হয়ে থাকে। এ এক অনাবিল শান্তি। আর এ অবস্থা ভোর পর্যন্ত বিরাজ করে।"

অতএব 'শবে বরাত' বা 'লায়লাতুল মুবারাকা" হলো লায়লাতুল কদর, তা কুরআন থেকেই প্রমাণিত হয়। আর এটিও সুস্পষ্ট যে, কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এ ঘোষণা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লার। ১৫ই শাবানের রাতের উল্লেখ কুরআনে নেই তা প্রমাণিত হলো। তফসীরকারকদের নীতি "কুরআনের একাংশ আরেকাংশের ব্যাখ্যা করে দেয়" তাও প্রমাণ করে দিল "লায়লাতুল মুবারাকা" আসলে "লায়লাতুল কাদর"। এখন প্রশ্ন উঠে যে, এ-রাতে মৃত্যু অথবা ভাগ্য নির্ধারিত হয় অথবা মৃত-আত্মীয়স্বজনদের আত্মা পৃথিবীতে আসে, এসব কি? এর উত্তর হলো, কুরআনে ও হাদীসে এর কোন উল্লেখ নেই। "লায়লাতুল কাদর" এর সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত আয়াতগুলোতে এর কোন উল্লেখ নেই। একটু চিন্তা করলেই বলা যায়, এ-সব কিছুই মনগড়া কথা। মৃত্যু সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

"আর আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কেউ মরতে পারে না। কেননা, এর জন্য এক মেয়াদ নির্ধারিত রয়েছে।" (সূরা আলে ইমরান : ১৪৬)। তিনি আরও বলেন, "তিনি বৃষ্টি অবতীর্ণ করেন। আর, গর্ভাশয়ে যা-ই আছে, তিনি তা জানেন। আর কেউ জানে না, আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে এবং (এটাও) কেউ জানে না কোন স্থানে সে মারা যাবে।" ( সূরা লুকমান : ৩৪)

সূরা হিজরের ২৪ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'আর নিশ্চয়ই আমরাই জীবিত করি ও আমরাই মৃত্যু দেই'। তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ যা চান, তাই করেন।" (সূরা হাজ্জ : ১৫) এছাড়া আরো বহু আয়াত রয়েছে, যা থেকে জানা যায়, মৃত্যু-সম্পর্কিত বিষয়াদী আল্লাহ্ তা'লা শাবানের ১৫ তারিখে নির্ধারণ করেন না, বরং এই তকদীর বা পরিমাপ আল্লাহ্‌র হাতে এবং এটা তিনি লায়লাতুল কাদরের রাতেও নির্ধারণ করেন না। এ মেয়াদ জন্ম হতেই নির্ধারিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "নিশ্চয় আমরা সবকিছু একটি পরিমাপে সৃষ্টি করেছি। আর আমাদের আদেশ চোখের-পলক ফেলার ন্যায়, এক নিমিষেই (কার্যকর হয়)।" (সূরা কামার : ৫০) তবে মানুষের আমল, দোয়া ও খোদার নৈকট্য-প্রাপ্তির কারণে এ তকদীর দীর্ঘায়িত হতে পারে। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "আর, যা (বা যে) মানুষের উপকার করে, তা (বা সে) পৃথিবীতে স্থায়ী হয়।" (সূরা রাআদ ১৭) পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া সেভাবেই অবলম্বন কর, যেভাবে তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করা উচিত। আর তোমরা কখনো আত্মসমর্পনকারী না হয়ে মরো না।" (সূরা আলে ইমরান : ১০৩) মৃত্যু যদি "লায়লাতুল মুবারাকাতে" নির্ধারিত হয়, তবে এ আয়াতের কি অর্থ করবেন? ইসলাম তো কর্মের কথা বলে, যা প্রতিনিয়ত করতে হয়। এ নয় যে একদিন বা এক রাতে ইবাদত কর, আর কোন এবাদতের প্রয়োজন নেই। তৌহিদ, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, তাকওয়া, দানখয়রাত এক রাত বা একদিনের ব্যাপার নয়। এ এক নিয়মিত-কর্ম। যদি এক রাতেই বছরের সব কিছু নির্ধারিত হয়, তবে এক রাতের পর সারাবছর ইবাদত আর আমলের কোন প্রয়োজন থাকে না। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "তুমি বল, 'হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের প্রাণের ওপর অবিচার করেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব পাপ ক্ষমা করে দিতে পারেন। নিশ্চয় তিনিই অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী। " ( সূরা যুমার: ৫৪) এ আয়াত খোদার ক্ষমার দ্বার এক রাতের জন্য নয়, বরং প্রতিটি মুহূর্তের জন্য খুলে দিয়েছে। প্রকৃত তওবা করলে যে কোন দিন , যে-কোন রাত, যে-কোন মূহুর্তে সে খোদার কৃপার অধিকারী হতে পারে। তাই খোদার সিদ্ধান্ত-বান্দার আমলের কারণে হয়। আল্লাহর এ-সিদ্ধান্ত আমল করার পরে হয়, আমল করার আগে নয়।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "তুমি যে কল্যাণই লাভ কর, তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আসে এবং তোমার যে অকল্যাণ হয়, তা তোমার নিজের কারণেই হয়।" (সূরা নিসা : ৮০) উদ্ধৃত কুরআনের-আয়াতগুলো এ বিষয়টি পরিষ্কার করে, সারা বছরের জন্য তকদীর নির্ধারিত হওয়া 'শবে বরাত' বা 'লায়লাতুল কদরে'-র সাথে সম্পৃক্ত নয়। ইসলামে কর্ম হলো এক চলমান প্রক্রিয়া, যা জীবনের শেষ-নিশ্বাস পর্যন্ত করে যেতে হবে। হাদিসের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই হযরত রসূলে করিম (সা.) "আইয়্যামুল বীজ" অর্থাৎ আলোকিত দিনগুলোতে প্রতিমাসে রোযা রাখতেন। আর এ দিনগুলো হলো প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ। এ সর্ম্পকে বুখারী, নাসাঈ ও মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলে সহীহ্ রেওয়াত রয়েছে। সুতরাং এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, হযরত রসূলে করীম (সা.) শুধুমাত্র শাবানের ১৫ তারিখে রোযা রাখেন নি, বরং প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ রোযা রেখেছেন। তাই প্রমাণিত হলো, ১৫ ই শাবান অর্থাৎ শবে বরাত বলে যা চালানো হচ্ছে, বিশেষ করে, এর সাথে শবে বরাত নামক দিনের রোযার কোন সর্ম্পক নেই। তবে রেওয়াত হতে জানা যায়, শাবান মাসে হযরত নবী করীম (সা.) অনেক বেশি রোযা রাখতেন। এর ব্যাখ্যায় অনেক কিছু বলা যায়। তবে রমযানের প্রস্তুতি হিসেবে যে এ-রোযাগুলো রাখতেন, এতে অধিকাংশ মুহাদ্দেসীন একমত। দ্বিতীয়ত, হযরত নবী করীম (সা.) প্রায়শই 'দাউদী রোযা' রাখতেন। আর এ নফল রোযা হলো এক দিন পর পর রাখা। বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে হযরত দাউদ (আ.)-এর রোযা ছিল উত্তম-যিনি একদিন পর পর রোযা রাখতেন। জানা উচিত, এ হলো নফল রোযা।

তথাকথিত শবে বরাতের পক্ষে ১৪ টি হাদীস উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। মুহাদ্দেসীন ও 'আসমাউর রেযালের' (অর্থাৎ বর্ণনাকারীদের সততা, স্মরণশক্তি, ইত্যাদি নির্ণয়করণ) পুস্তকাদীতে এসব রেওয়ায়েতকে "যয়ীফ" (দূর্বল) এবং "মাওযূ" (বানোয়াট) বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। এ সব হাদীসের এক বর্ণনাকারী "ইবনে আবি যাবারাহ" এর ওপর

"মাওযূ" হাদীসের অপবাদ রয়েছে। হাদীসের 'আসমাউর রেযালের' ওপর হযরত ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)-এর পুস্তক "তাকরীব"-এর ৩৯৬ পৃষ্ঠায় এর উল্লেখ আছে। 'আসমাউর রেযালের' ওপর বিখ্যাত পুস্তক "মীযানুল ই'তেদাল"-এতে হযরত ইমাম বুখারীর বরাতে 'শবে বরাত' সম্পর্কিত হাদীস সমূহের সনদের কয়েকজন বর্ণনাকারীকে "যয়ীফ" দুর্বল বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। সুতরাং ১৫ ই শাবান সর্ম্পকে বর্ণিত অধিকাংশ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। তবে মূল কথা হলো, যার উল্লেখ কুরআনে নেই এবং সুন্নাহ ও আসার থেকে সাব্যস্ত নয়, তা কি-ভাবে ইসলামের অংশ হতে পারে ? বলা হয়ে থাকে, ১৫ ই শাবানের রাতে আল্লাহ্ তাল'লা পৃথিবীর আকাশে অবতীর্ণ হয়ে বান্দাদের ক্ষমা করার ঘোষণা দেন, দান করার ঘোষণা দেন, ইত্যাদী। জেনে রাখা উচিত, এরূপ হাদীস শুধুমাত্র ১৫ ই শাবানের জন্য নির্ধারিত নয়। বরং আহাদীসে বর্ণিত হয়েছে, প্রত্যেক রাতে যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ পার হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটতম আকাশে অবতরণ করেন এবং ঘোষণা দেন, কে আছে যে আমার কাছে চাইবে, আর আমি তাকে দিব?.....। এছাড়া 'রমযানের ফযিলত' সর্ম্পকে আমরা সবাই জানি। এ মাসে জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং জান্নাতের সব দরজা খুলে দেওয়া হয়। রমযানের প্রথম ১০ দিন 'রহমতের দিন', দ্বিতীয় ১০ দিন 'মাগফেরাতের দিন' আর শেষ ১০ দিন 'নাজাতের'। আবার এর মধ্যে শেষ-দশকের বেজোড় রাতে "লায়লাতুল কাদর"ও আছে। অতএব ১৫ই শাবানের রাত সর্ম্পকে যা- কিছু বলা হয়, তা হাদীস হতে প্রমাণিত, সত্য নয়। বরং এর তুলনায় রমযানের প্রতিটি দিন ও প্রতিটি রাত এবং লায়লাতুল কাদর, যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম-এর গুরুত্ব অনেক বেশী এবং হযরত নবী করীম (সা.)উম্মতের দৃষ্টি জোরালোভাবে এদিকে আকর্ষণ করেছেন।

হালুয়া রুটি এবং আতশবাজীর সাথে হযরত নবী করীম (সা.) এর দূরতম সম্পর্ক নেই। এটি এক বিদাত। আজ যারা ইসলামের নামে এসব করছে, কুরআনের এ আয়াত তাদের জন্য সর্তকবাণী উচ্চারণ করছে এবং আমাদের সবাইকে পথ-প্রদর্শন করছে। আল্লাহ বলেন, " আর নিশ্চয় তাদের মাঝে এমনও একদল আছে, যারা কিতাবের বেলায় স্বরকে (এমনভাবে) বদলায়, যেন তোমরা তা কিতাবের অংশ মনে কর, অথচ তা অংশ নয়। আর তারা বলে, এ হলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। অথচ এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নয়। আর তারা জেনেশুনে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা বানিয়ে বলে। " ( সূরা আলে ইমরান : ৭৯)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সব ধরনের বিদাত থেকে মুক্ত রাখুন। (আমীন)

# শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, আহমদনগরের সদস্যা আমাদের আম্মা নূরজাহান বেগম, স্বামী-মরহুম ইমান আলী মোড়ল গত ০৮/০৪/২০১৫ তারিখ রোজ বুধবার সন্ধ্যা ৫-৫৫ মিনিটে আহমদনগর এর নিজ বাসায় ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মত্যুকালে মরহুমার বয়স হয়েছিল আনুমানিক ৮০ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতী-নাতনীসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান। মরহুমা জামা'তের একজন ওসীয়্যতকারী সদস্যা। তিনি মেহমান নেওয়াজী, সদ্ব্যবহার, পরোপকারী, নেক ও সরল মনের মানুষ ছিলেন। ২০০৯ সালে তিনি পুত্র আবু মোহসীন মোড়ল ও তার পরিবারের সাথে সুন্দরবন জামা'ত থেকে আহমদনগর জামা'তে হিজরত করেন। তিনি জামা'তের সকল সদস্য ও সদস্যার প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন। আহমদনগরে মরহুমার দাফন করা হয়। মহান আল্লাহ্ তা'লা যাতে মরহুমাকে জান্নাতুল ফেরদৌসের উচ্চ মাকাম এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সাবরে জামিল দান করেন, সেজন্য সকলের নিকট দোয়া প্রার্থনা করছি।

মরহুমার কনিষ্ঠ পুত্র
***মহিউদ্দীন আহমদ,*** আহমদনগর

* অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, আমার আম্মাজান আতেজান বিবি গত ১১/০৫/২০১৫ তারিখে নিজ বাসভবনে ভোর বেলায় ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি নওয়াবেকী জামা'তের সদস্যা ছিলেন। মুত্যুকালে মরহুমার বয়স হয়েছিল প্রায় ৮৫ বছর। মহান আল্লাহ্ তা'লা যাতে মরহুমাকে জান্নাতুল ফেরদৌসের উচ্চ মাকাম এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সাবরে জামিল দান করেন, সেজন্য সকলের নিকট দোয়া প্রার্থনা করছি।

**মোহাম্মদ জুলফিকার আলম,** ঢাকা

* আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঘাটুরার অন্তর্ভুক্ত সুহিলপুর (মিরহাট) নিবাসী মরহুম শেখ নজিবুর রহমান (পিতা মরহুম নেজাবত উল্লাহ্) এর স্ত্রী নাসিরা বেগম ৭০ বছর বয়সে গত ১৩ এপ্রিল সোমবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে মরহুমা ১ ছেলে ও মেয়েসহ অনেক আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। মহান আল্লাহ্ তা'লা যাতে মরহুমাকে জান্নাতুল ফেরদৌসের উচ্চ মাকাম এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সাবরে জামিল দান করেন, সেজন্য সকলের নিকট দোয়া প্রার্থনা করছি।

**এস, এম, সেলিম, ঘাটুরা**

* অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, গত ২১ এপ্রিল ২০১৫ তারিখ বেলা ১২-০০টায় আমাদের শ্রদ্ধেয় পিতা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের সদস্য জনাব শেখ মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল প্রায় ৭৭ বছর। তিনি একজন জন্মগত আহমদী এবং মুসী ছিলেন। তার ওসীয়্যত নং ৯০১৬০। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ মেয়ে ও তিন ছেলে রেখে গেছেন। মহান আল্লাহ্ তা'লা যাতে মরহুমকে জান্নাতুল ফেরদৌসের উচ্চ মাকাম এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সাবরে জামিল দান করেন, সেজন্য সকলের নিকট দোয়া প্রার্থনা করছি।

***শেখ মোহাম্মদ মছিউল ইসলাম রনি***
ব্রাহ্মণবাড়িয়া

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)
খলীফাতুল মসীহ্ সানী

# হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)-এর কর্মময় জীবনের কিছু দিক

মূল: রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স
ভাষান্তর: **মহিউদ্দিন আহমদ**

**খলীফাতুল মসীহ হিসাবে প্রথম ভাষণ**

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) এর খলীফা নির্বাচনের সময় একটি ক্ষুদ্র দল তাঁর নিয়োগে বরং নেযামে খেলাফতের প্রতিই দ্বিমত পোষণ করে। এই গোষ্ঠি মূল জামা'ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে লাহোরে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে (যা পরে লাহোরী গ্রুপ বলে পরিচিত হয়)। যা হোক আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য সমর্থন সর্বদাই খেলাফতের সাথে এবং হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) এর খলীফা নির্বাচিত হবার পর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ক্রমাগত উন্নতি ও বিস্তার লাভ করতে থাকে। অপরপক্ষে খেলাফত কে অস্বীকারকারীগণ ক্রমান্বয়ে ক্ষীয়মান ও বিলীন হয়ে যেতে থাকে। এই সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ হযরত খলীফাতুল মসীহ-সানী (রা.) তাঁর উর্দূপুস্তক "আইনায়ে সাদাকাত " পুস্তকে লিখেছেন।

জামা'তের প্রতি প্রথম ভাষণে হযরত খলীফাতুল মসীহ-সানী (রা) নেযামে খেলাফতের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেন। কলেমা শাহাদাত পাঠ করার পর হুজুর বলেন, "বন্ধুগণ শুনুন এটা আমার বিশ্বাস এবং দৃঢ় বিশ্বাস যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লাই আমাদের প্রভূ ও প্রতিপালক। তিনি এক এবং তার কোন অংশীদার নাই। আমার প্রিয় বন্ধুরা এটা আমার বিশ্বাস যে এখন এমন কেউ আসতে পারে না যে শরীয়তের আইনের যা আমাদের পরম প্রভু হযরত মুহম্মাদ (সা.) এনেছিলেন বিন্দুমাত্র রদ করতে পারে। বন্ধুগণ আমার সেই প্রিয় প্রভূ সকল নবীদের নেতা, তার মর্যাদা এতই গৌরবজনক যে তার দাসত্ব, সার্বিক আনুগত্য এবং পূর্ণ বিশ্বস্ততা অবলম্বন করে একজন মহান আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জন করতে পারে। এটাই সত্য যে এক মাত্র পবিত্র মহানবী (সা.) এরূপ গৌরবজনক মর্যাদার অধিকারী। তাঁর দাসত্ব অবলম্বনে মু'মিন সুউচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হতে পারে। এটাই আমার বিশ্বাস এবং সম্পূর্ণ ও দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতে আমি এই বিবৃতি পেশ করছি।"

"এটা আমার আরও বিশ্বাস যে পবিত্র কুরআন সেই প্রিয় গ্রন্থ যা মহানবী (সা.) এর প্রতি নাযিল হয়েছিল এবং এটাই একমাত্র পূণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ পুস্তক (খাতাম-উল-কুতুব) এবং পুর্ণ বিধান সম্বলিত (খাতাম-উল-শরীয়াহ)।"

অধিকন্ত আমার আরও অকাট্য দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ) তিনিই ( হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আ.), যার সম্পর্কে সহীহ মুসলিম হাদিসে লিপিবদ্ধ আছে।

তিনি সেই একই ইমাম যার আগমন সম্পর্কে সহীহ বোখারীতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। পুনরায় আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে হযরত মুহম্মদ (সা.) এর শরীয়তের কিছুমাত্র কখনও বাতিল হতে পারে না।হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সাহাবীগনের পদচিহ্ন অনুসরণ করুন, কেননা তারা ছিলেন দোয়া ও প্রশিক্ষণের বাস্তব উদহারণ। মহানবী (সা.) এর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় ইজমা যা সংগঠিত হয় তা ছিল খেলাফতে রাশেদীনের প্রতিষ্ঠা। নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করুন এবং ইসলামের ইতিহাস পড়ুন। আপনারা দেখবেন যে খোলাফায়ে রাশেদীন এর সময় কার মুসলমানদের উন্নতি নিম্ন মুখি হওয়া শুরু করে যখন খেলাফত রাষ্ট্রিয় শাষনে পরিণত হয়। বর্তমানে ইসলামের অবস্থা ও ইসলাম অনুসারীদের অবস্থা আপনারা নিজেরাই উপলব্ধি করছেন।

অত:পর সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.) এর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক তেরশত বৎসর পরে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) কে নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা তার বিশিষ্ট মনোনীত বান্দাদের ভিতর হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) কে সুউচ্চ মর্যাদা প্রদান করুন। এবং তার আত্বার ওপর অগনিত আর্শীবাদ ও করুণা বর্ষণ করুন। যেরূপ তাঁর হৃদয় এবং আত্মা মহানবী (সা.) ও প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) এর প্রতি ভালবাসায় ভরপুর ছিল, সেরূপ আল্লাহ্ তা'লাও তাকে বেহেস্তে তাদের নৈকট্য প্রদান করুন। তিনি ছিলেন এই আন্দোলনের প্রথম খলীফা এবং আমরা সবাই তার হাত বয়াত গ্রহণ করেছিলাম এই আন্দোলন যতদিন থাকবে বিশ্বাস ক্রমাগত বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ভাবে সমৃদ্ধতর হতে থাকবে।

এখনই আপনারা সবাই উচ্চস্বরে চিৎকার করে আবেদন জানিয়েছেন যে এই দায়িত্ব (খেলাফত) আমার নেয়া উচিৎ এবং বয়আত গ্রহণের মাধ্যমে আপনারা তা বাস্তবায়িত করেছেন। সুতরাং আমি মনে করছি আমার বিশ্বাস আপনাদের সামনে পুর্নব্যক্ত করা উচিৎ।

আমি অকপটে বলতে চাই যে আমার হৃদয় ভীতিপূর্ণ এবং আমি নিজেকে দুর্বল মনে করি। মহানবী (স.) এর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে একজন দাসকে তার সামর্থ্যের বাইরে কিছু করতে বলবে না। এখন যেহেতু আপনারা আমাকে দাসত্বে নিয়োজিত করেছেন, আমাকে সেই সব করতে বলবেন না যা আমি পারি না। আমি জানি যে আমি দুর্বল এবং পাপী। কিভাবে আমি দাবি করতে পারি যে আমি সমগ্র বিশ্বকে পথ দেখাবো সত্যকে বিস্তার করবো এবং সঠিক পথ দেখাবো?

আমরা সংখ্যায় অতি নগণ্য অপরপক্ষে সত্যের বিরুদ্ধ বাদীরা সংখ্যায় বিপুল, কিন্তু আমাদের প্রতিপালকের করুণা ও অনুগ্রহে আমাদের আশা উদ্যম কখনই নি:শেষ হবে না আপনারা এই দায়িত্বভার আমার স্কন্ধে সমর্পন করেছেন। সুতরাং আমার কথা শুনুন, এই দায়িত্ব পালনে আমাকে সাহায্য করুন। সেই সাহায্য হলো মহান আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও পথ নির্দেশ প্রার্থনা করা। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের স্বার্থে আমাকে মান্য করুন। আমি একজন মানুষ এবং দুর্বল মানুষ। যদি আমার

কোন ত্রুটি থাকে, তাকে উপেক্ষা করুন। যদি আপনারা কোন ভূল করেণ, সর্বশক্তিমানা আল্লাহ তায়লার নামে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, সে সব আমির উপেক্ষা করবো এবং ক্ষমা করবো। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা হবে এই জামা'তের লক্ষ্য সমূহ অর্জনে বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ করা। আপনাদের বয়াত দ্বারা আপনারা যে বন্ধন সৃষ্টি করেছেন, তাকে আরও শক্তিশালী করুন। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে আমরা একত্রে আমাদের ছোট খাটো দুর্বলতা সমূহ অতিক্রম করে যাব। প্রতিটি ন্যায় সঙ্গত ব্যাপারে (আমর-বিল মারুফ) আপনাদের আমার প্রতি অনুগত থাকতে হবে। যদি আমি এরূপ বলি, খোদা না করুন যে, আল্লাহ এক না, সেই একক সত্য খোদার নামে শপথ করছি, যিনি আমাদের প্রত্যেকের জীবনের স্থিতিদাতা, যিনি এক এবং যার কোন অংশীদার নেই এবং যার সম্পর্কে পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেয় যে তার মত কোন কিছুই নাই, তাহলে আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আমাকে বিশ্বাস করবেন না, যদি খোদা না করেন,আমি নবুওয়্যাতের কোন ত্রুটি খুঁজে বের করি। আল্লাহ্‌র নামে আমি আপনাদের নির্দেশ দিচ্ছি যে আমাকে বিশ্বাস করবেন না যদি আমি পবিত্র কুরআন শরীফের কোন ভুলের কথা বলি। যদি আমি প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর শিক্ষার বিরুদ্ধে কিছু বলি যা তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে এলহাম পেয়ে বর্ণনা করেছেন, তাহলে আমাকে বিশ্বাস করবেন না কিন্তু আমি বলি এবং আবারও বলি যে আমার অবাধ্যতা করবেন না, যখন আমি ভালো বিষয় (আমর বিল-মারুফ) সমূহে নির্দেশ দিই। যদি আপনারা আনুগত্য করেন, বাধ্যতার সাথে কাজ করেন, যে বয়আত করেছেন তার বন্ধন দৃঢ় করেন, তাহলে স্মরন রাখবেন যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সাহায্য করবেন এবং আমাদের সন্মিলিত দোয়া গৃহীত হবে। আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে আমাকে সাহায্য করা হবে।

প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) প্রকৃত ইসলাম প্রচারও প্রতিষ্ঠার যে জামা'ত স্থাপন করেছেন তা নিদিষ্ট সময়ে আমার প্রতি ন্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং দোয়া করুন, খেলাফতের সাথে আপনাদের বন্ধন দৃঢ়তর করুন এবং কাদিয়ানে বার বার আসার চেষ্টা করুন। আমি প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) কে বলতে শুনেছি এবং আমি তাকে প্রায়ই বলতে শুনেছি যে কাদিয়ানে বার বার আসে না তার বিশ্বাসে কিছুটা খুঁত থাকার শঙ্কা থেকে যায়। আমাদের প্রথম কাজ হল ইসলাম প্রচারাভিযান করা, এবং ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা করা, যাতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লার করুণার অনুগ্রহ আমাদের ওপর প্রবল ধারায় বর্ষিত হয়। আমি আপনাদের বার বার বলছি এবং আবারও বলছি যে আপনারা যেহেতু বয়আত গ্রহণ করেছেন, এবং আমার সাথে একটি বন্ধন স্থাপন করেছেন, এই সর্ম্পকে আপনারা আনুগত্য প্রদর্শন করুন এবং আপনাদের দোয়ায় আমাকে স্বরণ রাখুন। আমি নিশ্চিত ভাবেই আমার দোয়ায় আপনাদের স্মরণ রাখবো। অবশ্য আমি ইতিমধ্যেই আপনাদের জন্য দোয়া করছি। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমি এমন কোন আবেদন জানাইনি যাতে আহমদী জামা'তের সদস্যদের জন্য দোয়া শামিল করিনি। পুনরায় শুনুন, এমন কিছুই করবেন না যা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আনুগত্যহীনরা করে থাকে। আমাদের প্রার্থনা হওয়া উচিৎ আমাদের জীবন ও আমাদের মৃত্যু যেন মুসলমান হিসাবে হয়।

**আহমদীয়তের দ্বিতীয় খেলাফতের কয়েকটি দিক**

আহমদীয়তের দ্বিতীয় খেলাফতের কালে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থাদি নেয়া হয়। লন্ডনে একটি মসজিদ ও মিশন হাউজের জন্য জমি ক্রয় করা হয়, এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ-সানী (রা.) নিজেই ১৯২৪ সালে যুক্তরাজ্য পরিদর্শনের সময় মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই মসজিদ যা ছিল লন্ডনে মুসলমানগণ কর্তৃক নির্মিত প্রথম মসজিদ এবং যার জন্য ভারতবর্ষের আহমদী মহিলাগণ স্বত:স্ফুর্ত ভাবে তাদের স্বর্ণালঙ্কার দান করেছিলেন, পরবর্তী ২(দুই) বৎসরে যার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়।

***লন্ডন পরিদর্শন ১৯২৪ইং***

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর লন্ডন পরিদর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল "ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অব রিলিজিয়ন্স" এ অংশ গ্রহণ করা, যেখানে বিবিধ ধর্মবিশ্বাসের শীর্ষ স্থানীয় নেতাদের সভায় বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ-সানী (রা.) দশজন সঙ্গী সহকারে ১২ই জুলাই কাদিয়ান ত্যাগ করেন। দলটি ১৫ই জুলাই জাহাজ যোগে বোম্বে থেকে রওনা হয়। জাহাজটি আটদিন পরে এডেন বন্দরে পৌছে এবং পোর্ট সৈয়দে ২৮ তারিখে সন্ধ্যায় প্রবেশ করে। হযরত খলীফাতুল মসীহ-সানী (রা.) কায়রোতে তিন দিন অবস্থান করেন। অত:পর তিনি জেরুজালেম ও দামেস্ক যান।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) ২২ শে আগষ্ট ১৯২৪ ইং তারিখে লন্ডন পৌছান এবং চেসহ্যাম প্যালেস, বেলগ্রাভিয়া এস.ডব্লিউ ১ এ অবস্থান করেন। রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স এর অক্টোবর ১৯১৪সংখ্যায় উক্ত লন্ডন ভিজিট সর্ম্পকে লেখা হয়, "লন্ডনে হযরত আকদস খলিফাতুল মসীহ-সানী (রা.)-এর আগমনের খবর লন্ডনের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ খবরের কাগজ সমূহে যথোপযুক্ত বিবরণ সহ প্রকাশিত হয়। মহামান্য খলিফাতুল মসীহ পোর্টসমাউথে ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯২৪ তারিখে প্রথম ভাষণ প্রদান করেন" এক বৃহৎ শ্রোতা মন্ডলীর সামনে পোর্টর্সমাউথে এর পাইলস হলে উক্ত বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। বক্তৃতার শিরোনাম ছিল, " এ ম্যাসেজ ফ্রম হেভেন"। লিভিং রিলিজিয়ন্স লন্ডন কনফারেন্স ২২ শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪ ইং থেকে শুরু হয়। "দি আহমদীয়া মুভমেন্ট" নামে হযরত খলীফাতুল মসীহ-(রা.) এর প্রবন্ধ ২৩ শে সেপ্টেম্বর উপস্থাপন করা হয়। চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান রচনাটি পাঠ করে শুনান। রচনাটি সাগ্রহে গৃহীত হয় এবং অত্যন্ত প্রশংসিত হয়।

শ্রোতারা গভীর মনোযোগের সহিত প্রবন্ধটি শুনেন এবং ইসলামের প্রতিটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপনের সাথে সাথে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে। বক্তৃতা শেষে শ্রোতারা বারংবার অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং সভার প্রেসিডেন্টকে তার মন্তব্য করার জন্য বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। তিনি সম্মানিত খলিফাতুল মসীহ-সানী(রা.) কে ধর্মীয় সত্যতা সম্বলিত তথ্যাবলী সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। (রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স, অক্টোবর ১৯২৪ ইং)

হযরত খলিফাতুল মসীহ-সানী (রা.) ১৯শে অক্টোবর ১৯২৪ ইং বিকাল ৪টায় লন্ডন মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে দুইশত জনের ওপর বিভিন্ন জাতীয়তা ও ধর্মের লোক উপস্থিত ছিলেন। একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা হযরত খলিফাতুল মসীহ-সানী (রা.)ব্যাখ্যা করে বলেন যে মসজিদ কেবল মাত্র আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করার জন্য। মৌলবী অব্দুরা রহিম দর্দ ২০শে অক্টোবর ১৯২৪ ইং সালের এক টেলিগ্রাফ মারফত কাদিয়ানে হযরত শেরআলী (রা.) সাহেব কে জানান, 'হযরত খলিফাতুল মসীহ-সানী (রা.) বলেন, "তিনি আশা করেন এই মসজিদ সকলপ্রকার বিরোধ ও সংঘাত দূর করতে সাহায্য করবে এবং মানুষের ভিতর শান্তি, বন্ধুত্ব, শুভেচ্ছা ও প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখবে"। (রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স, নভেম্বর-১৯২৪ ইং)

**আন্তধর্মীয় মিল উৎসাহিত করণ**

দ্বিতীয় খেলাফতের সময় আন্তধর্মীয় ও ধর্ম অভ্যন্তরস্থ বিশ্বাস সমূহের মিল ও সাদৃশ্য উৎসাহিত করে আলোচনা সভা শুরু করা হয়। হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.) ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, অ-মুসলিমদেরকেও ইসলামের মহানবী (স.)-এর জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে সত্যিকারের তথ্য অবহিত করা হোক।

একটি পরিকল্পনার (যা ১৭ই জুন ১৯২৮ইং উদ্বোধন করা হয়)অধীনে প্রতি বছর সাধারন সভা (পাবলিক মিটিং) সমূহ আয়োজন করা হয়, যেখানে মুসলমান ও অ-মুসলমান বক্তারা এই বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন।এর কিছু সময় পরে একটি অন্য ধরনের সম্মেলন (রিলিজিন্স ফাউন্ডারস ডে) উপস্থাপন করা হয়। এই সমস্ত সভা সমূহে বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসের অনুসারীদের নিদ্ধারিত বিষয়ে স্ব স্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে বক্তৃতা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই সমস্ত জমায়েতসমূহ আন্ত:সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক উন্নতি এবং ভুল ধারণা ও ভুল বুঝাবুঝি দূর করতে সহায়ক হয়। এই জাতীয় কার্যক্রম এখন পর্যন্ত চালু আছে।

**তাহরীকে জাদীদ**

১৯৩৪ ইং সনে হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.) একটি নতুন পরিকল্পনা পেশ করেন। যা তাহরীকে জাদীদ নামে পরিচিত হয়। যার মাধ্যমে সময়ের সাথে সাথে আহমদীয়া জামা'তের সদস্যদের ক্রমবৃদ্ধি মূলক অর্থনৈতিক উৎসর্গের মাধ্যমে বিশ্বব্যপী ইসলাম প্রচারে এক ব্যাপক প্রবৃদ্ধি সংগঠিত হয়। মসজিদ এবং প্রচার কেন্দ্র সমূহ স্থাপন করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন অংশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ডিসপেন্সারী সমূহ স্থাপন করা হয়। স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান, তার বই "আহমদিয়াত দি রিনেইসেন্স অব ইসলাম" বইতে লিখেন: "এই সমস্ত কার্যবলী জামা'তের মূল উদ্দেশ্য অর্জনের প্রচেষ্টায় সহায়ক স্বরূপ পরিণত হয়, অর্থাৎ সর্বোচ্চ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীর চর্চা করা, আল্লাহতায়ার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সর্বদাই তার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা করা, এবং আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্ট জীবের প্রতি কোন বৈষম্য ব্যতিরেকে উপকারী সেবা সমূহ প্রদান করা।

ইতিপূর্বে ১৯৩৪ ইং সনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত "মজলিস আহরার-ই-ইসলাম" (শব্দগত অর্থ মুক্ত চিন্তার সংগঠন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যা ছিল উগ্র ধর্মীয় চরমপন্থীদের দল) নামে এক রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রচণ্ড বিরোধীতার সম্মুখিন হয়। ঐ বছর অক্টোবর মাসে আহরারীরা কাদিয়ানের সন্নিহিত স্থানে এক জনসভার আয়োজন করে, যেখানে আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তব্য রাখা হয়। ঐ সমস্ত জঘন্য ও নীতি বিবর্জিত কার্য্যাবলী সত্বেও জামা'তের সদস্যরা সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন করে, ফলে পরিস্থিতি তীব্রতর হতে পারেনি।

এই পটভূমিকায় হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) পরপর তিনটি জুমুআর খোতবায় (২৩, ৩০ শে নভেম্বর ও ৭ই ডিসেম্বর ১৯৩৪ ইং) "তাহরীকে জাদীদ" পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। প্রাথমিক ভাবে পরিকল্পনাটি তিন বছরের জন্য করা হয়, কিন্তু পরবর্তীতে স্থায়ী রূপ দেয়া হয়। তাহরীকের অধীনে সরল জীবন যাপন, অর্থনৈতিক ত্যাগ স্বীকার এবং ইসলামের সেবা ও প্রচারের জন্য সময় কোরবানী করা উৎসাহিত করা হয়। ২৩ ও ৩০ শে নভেম্বরের খোতবায় উনিশটি চাহিদা পেশ করা হয় যা তাহরীকের উদ্দেশ্যবলী অর্জনে সহায়ক হবে। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) এই চাহিদাগুলি সম্পর্কে তাঁর ৩০ শে নভেম্বরের খোতবায় বলেন: "এদের প্রত্যেকটি অনেক বিচার বিবেচনার পর নির্বাচন করা হয়েছে। এদের ভিতর একটিও নাই যা জামা'তের উন্নতিতে উপকারে আসবে না। তাদের প্রত্যেকটিই একটি বীজ এর ন্যায়। এইরূপ একটি বীজ যা ব্যাপক মাত্রায় বর্ধিত হবে, পূর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত গাছে পরিণত হবে। যা আমাদের শত্রুদের পরাভূত করবে। এগুলোর ভিতর একটিও নাই যাকে উপেক্ষা করা যেতে পারে। এগুলোর ভিতর একটিও নাই যেটা ব্যতীত আমাদের উন্নতির সৌধ সম্পূর্ণতা পেতে পারে। সুতরাং আমি আমার জামা'তের লোকদের বলছি, যারই পক্ষে সম্ভব, অবশ্যই যেন অংশগ্রহন করে, এই ভাবে জামা'তের দ্রুততর সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করে এবং মহান আল্লাহ ত'লার আশিস অর্জনের চেষ্টা করে।"

**বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রচার কেন্দ্র স্থাপন**

যুক্তরাজ্যে (ইংল্যান্ডে) ১৯১৩ ইং সনে, শ্রীলংকায় ও মরিশাশে ১৯১৫ ইং সনে ইসলাম প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ১৯২১ ইং সনে আমেরিকায় ও আফ্রিকায় ইসলাম প্রচার শুরু হয়। তাহরীকে জাদীদ পরিকল্পনার অধীনে পশ্চিম ও পূর্ব আফ্রিকায়, মধ্যপ্রাচ্য, ত্রিলিদাদ ও গায়ানাসহ বিশ্বের বিভিন্ন অংশে প্রচারক পাঠানো হয়। ইউরোপে স্পেন, ইটালী, আলবেনিয়া, যুগোস্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, পোলান্ড ও সুইজারল্যান্ডে মিশনারী বা ধর্ম প্রচারকগণ পাঠানো হয়। যদিও কোন কোন দেশে স্থানীয় অসুবিধার সময় প্রচার কেন্দ্র বন্ধ করে দিতে হয়।

লন্ডনের "ফজল মস্ক" ইউরোপের প্রথম আহমদীয়া মসজিদ, যার ভিত্তি প্রস্তর ১৯২৪ ইং সনে স্থাপন করা হয়। হল্যান্ডের হেগে ইউরোপের দ্বিতীয় মসজিদ নির্মাণ করা হয় এবং ১৯৫৬ ইং সনে কোপেন হেগেন, ডেনমার্কে একটি প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। হামবুর্গে ১৯৫৭ ইং সনে "ফজল-ই-উমার মস্ক" এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। পরবর্তী বছর ১৯৫৮ ইং সনে ফ্রাঙ্কফুর্টে "মসজিদ নূর" এর উদ্বোধন করা হয়। জুরিখে ১৯৫৯ ইং সনে মসজিদের জন্য জমি ক্রয় করা হয় এবং ২৫ শে আগষ্ট ১৯৬২ ইং সনে এই মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। দ্বিতীয় খেলাফতের সময় কয়েকটি ভাষায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদ সম্পন্ন হয়। ডাচ ভাষায় ১৯৫২ ইং সনে ও ডেনিশ ভাষায় ১৯৬১ ইং সনে সম্পূর্ণ কোরআনের অনুবাদ বের হয়। ১৯৫৩ ইং সনে জার্মান ভাষায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়, যার দ্বিতীয় সংস্করন ১৯৫৯ ইং সনে বের হয়। দ্বিতীয় খেলাফতের সময় শুরু করা ৪৬ টি বৈদেশিক প্রচার কেন্দ্র, যা সময়ের সাথে সাথে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, এর মাধ্যমে পৃথিবীর কোনায় কোনায় প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) এর বাণী প্রচারের ভবিষ্যদ্বাণী সর্বতোভাবে পূর্ণতা লাভ করে।

তাহরীকে জাদীদ প্রতিষ্ঠা ছিল ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ যা ব্যাপক মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসে। পাক-ভারত উপমহাদেশের বাইরে জামা'তের কার্যাবলি তাহরীকে জাদীদ এর অংশ হিসাবে পরিচালিত হয়, এবং বর্তমানে খলিফাতুল মসীহ এর তত্ত্বাবধানে তাহরীকে জাদীদ দুইশত এর ওপর দেশে মিশন হাউজ বা প্রচার কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করছে।

**মুসলেহ মাওউদ হওয়ার দাবী**

২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ ইং সালের ভবিষ্যদ্বাণীর তিনিই যে উদ্দেশ্য তা বিবিধ কারণে সুস্পষ্ট ভাবে দাবী করতে তিনি বেশ কিছু সময় বিরত থাকেন। ১৯৩৭ ইং সনের এক চিঠিতে তিনি লিখেন : "...এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর আমি যতদূর সম্ভব পর্যালোচনা করেছি, আমার খেলাফতের সময়কালিন অর্জন সমূহে তার ৯০% সমর্থন পাওয়া যায়। যেহেতু আমি মনে করি না যে, এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর যিনি উদ্দেশ্য তার জন্য এটা দাবী করা প্রয়োজন যে, ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ তার ব্যক্তি সত্তায় পূর্ণ হয়েছে বা তাকে বুঝাচ্ছে, আমি এরূপ দাবী করার কোন প্রয়োজনিয়তা দেখি না। যাহোক আমি অবশ্যই মনে করি যে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর একটি বড় অংশই আমার মাধ্যমে পূর্ণ করেছেন ..." । পরবর্তীতে ১৯৪০ ইং সনের এক জুমুআর খোতবায় তিনি বলেন : "জনসাধারণ চেষ্টা করেছে যে, আমিই প্রতিশ্রুত সংস্কারক তা দাবী করা উচিত। কিন্তু আমি তা কখনোই আবশ্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করিনি। যদি সত্যই এবং প্রকৃত পক্ষে আমি প্রতিশ্রুত সংস্কারক হয়ে থাকি, এইরকম দাবী করতে আমার ব্যর্থতায় তা প্রভাবিত (ক্ষতিগ্রস্ত) হবে না।" প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত সংস্কারক যে তিনিই এটা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করা সত্বেও, হযরত খলীফাতুল মসীহ-সানী (রা.) এই সময় দাবী করার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি।

যাহোক ১৯৪৪ইং সনে খলীফাতুল মসীহ-সানী (রা.) কে আল্লাহ্‌তায়ালা এক স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁর সুমহান মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত করেন। সেই সময় তিনি ১৩, টেম্পল রোড, লাহোরে অ্যাডভোকেট শেখ বশীর আহমদ এর বাসায় সাময়িকভাবে অবস্থান করছিলেন। স্বপ্নের বিষয় বস্তু তাকে সন্দেহাতীত করে যে তিনি যে প্রতিশ্রুত সংস্কারক তা সাধারণ ঘোষণা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তিনি ২৮ শে জানুয়ারী ১৯৪৪ইং সনে শুক্রবারের খোতবায় স্বপ্নটি বিস্তারিত বর্ণনা করেন এবং সাধারণ ঘোষণা প্রদান করেন। তিনি নিম্নে বর্ণিত ভূমিকা দিয়ে শুরু করেন: "আমি আজ কিছু বিষয় বলতে চাই যা আমার মানসিক প্রকৃতি এর প্রেক্ষিতে আমি ঘোষণা করতে অসুবিধা অনুভব করছি, কিন্তু যেহেতু কিছু ভবিষ্যদ্বাণী এবং ঐশ্বরীক নির্দেশ এই ব্যাখ্যার সাথে জড়িত, তাই আমি আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিরত থাকতে পারছি না।"

২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪ইং সনে হোসিয়ারপুরে বিশেষভাবে আহুত এক সভায় এই স্বপ্ন সম্পর্কে আরও ঘোষণা দেয়া হয়। এটা ছিল সেই একই দিন এবং একই স্থান, যেখানে ৫৮ বৎসর পূর্বে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) ভবিষ্যদ্বাণীটি করেছিলেন। স্যার জাফরুল্লাহ খান (রা.) তার "আহমদীয়াত রিনেইসন্স অফ ইসলাম" পুস্তকে সভার পরিবেশ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন : "হযরত খলীফাতুল মসীহ- সানী (রা.) সূরা ফাতেহা পাঠের মাধ্যমে তার বক্তব্য শুরু করেন। আবেগ মথিত কণ্ঠে তিনি কিছু আয়াত পুনরাবৃত্তি করেন এবং পবিত্র কুরআন থেকে কয়েকটি দোয়া পাঠ করেন। শ্রোতারা গভীর ভাবে অভিভূত হয়ে পড়েন। এবং অশ্রুসিক্ত চোখ ও আবেগ তাড়িত হৃদয়ে তাঁর সাথে সাথে দোয়াগুলি পুনরাবৃত্তি করেন। অতঃপর তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর ২০ শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ ইং সালের ভবিষ্যদ্বাণীর পটভূমিকা বর্ণনা করেন এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও কিভাবে এর প্রতিটি অংশ আশ্চর্যজনক ভাবে পূর্ণ হয়েছে তা ব্যাখ্যা করেন..." প্রতিশ্রুত সংস্কারক (মুসলেহ মাওউদ) এর ওপর আরও কয়েকটি মিটিং ১২ ই মার্চ ১৯৪৪ ইং লাহোরে, ২৩শে মার্চ ১৯৪৪ ইং লুধিয়ানায় এবং ১৬ই এপ্রিল ১৯৪৪ ইং দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। যারা খলীফাতুল মসীহ-সানী (রা.) কে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন বা তাঁর জীবন বৃত্তান্ত মনোযোগের সহিত পর্যালোচনা করেছেন এমন কারোরই সন্দেহ ছিল না যে, তিনিই সেই মুসলেহ মাওউদ, যার আগমন সম্পর্কে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা আমাদেরকে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) এর সত্যতা এবং তাঁর দাবীর স্বপক্ষে একটি বড় নিদর্শন সরবরাহ করে। মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী প্রতি বছর সমগ্র পৃথিবীতে বিশেষ ভাবে আহুত মিটিং সমূহে স্মরণ করা হয়।

**প্রশাসন**

দ্বিতীয় খেলাফতের প্রথম দিকে হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.) কি ভাবে ইসলাম বিস্তার জোরদার করা যায় তা আলোচনা করার জন্য এক মজলিসে শূরা আহ্বান করেন। ১৯২২ ইং সনে মজলিস শূরা (পরামর্শ সভা) জামা'তে স্থায়ী কাঠামো লাভ করে। ইহা সাধারণত বাৎসরিক ভাবে মিলিত হয়ে জামা'তের বিভিন্ন ব্যাপারে যুগ খলিফার বিবেচনার জন্য যথোপযুক্ত পরামর্শ পেশ করে।

১৯১৯ ইং সনে বিভিন্ন বিভাগ (নিযামাত) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই ভাবে জামা'তের প্রশাসনিক কাঠামো শক্তিশালী করা হয়।

পরবর্তীতে জামা'তের বিভিন্ন অংশের জন্য সহায়ক সংগঠন সমূহ স্থাপন করা হয়। সর্বপ্রথম ১৫ বছর উর্ধ্ব মহিলাদের জন্য লাজনা ইমাইল্লাহ (১৯২২ ইং সনে প্রতিষ্ঠা করা হয়) এবং ১৫ বছরের নীচের বালিকাদের জন্য নাসেরাতুল আহমদীয়া। ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৪৪ ইং সালের বাৎসরিক জলসার সময় হযরত খলিফাতুল মসীহ-সানী (রা.) মহিলাদের সম্বোধন করে নতুন প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের সদস্যদের স্বাক্ষরতা, ইসলামের প্রধান প্রধান আদেশ-নিষেধ সমূহ যেন সবাই বুঝে এবং নামাজের অর্থ ও মূল তত্ত্ব (দর্শন) যাতে সবাই জানে তা নিশ্চিত করার জন্য জোরালো নির্দেশ প্রদান করেন। কিছু সময় পর পুরুষদের জন্য অনুরূপ সংগঠন সমূহ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ৪০ বছর বয়সের নীচের পুরুষদের জন্য মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া (১৯৩৮ ইং সালে), ৪০ উর্ধ্ব পুরুষদের জন্য মজলিস আনসারুল্লাহ এবং ১৫ বৎসর নীচের বালকদের জন্য আতফালুল আহমদীয়া।

প্রথমে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) এর সময় তালিমুল ইসলাম হাই স্কুল স্থাপন করা হয় এবং তা ইন্টারমিডিয়েট (উচ্চ মাধ্যমিক) কলেজ পর্যন্ত উন্নীত হয়। কিন্তু ১৯০৫ ইং সনে বন্ধ হয়ে যায়। স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত পড়াশুনার সুযোগ রেখে ১৯৪৪ ইং সনে তালিমুল ইসলাম কলেজ পুন:প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভারত বিভাগের পর রাবওয়ায় নতুন ভবন নির্মাণ কালীন সময়ে কলেজটি সাময়িক ভাবে লাহোরে স্থানান্তর করা হয়। কলেজটি সকল যোগ্য ছাত্রের জন্য উন্মুক্ত ছিল। ১৯৪৪ ইং সনে কলেজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হযরত খলীফাতুল মসীহ-সানী (রা.) বলেন: "কলেজের দরজা ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে সবার জন্য উন্মুক্ত। সকল সম্প্রদায়েরই শিক্ষা প্রয়োজন। মানুষ হিসাবে সকলের জন্য শিক্ষা সম্ভব ও সহজ করা আমাদের কর্তব্য ...। এই কলেজের দরজা সবার জন্য খোলা থাকবে। যারা এখান থেকে লাভবান হতে চায়, তাদের সবার জন্য এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সর্বপ্রকার সাহায্য প্রদান করবে।"

১৯৫৩ ইং সালের ২৬ শে জুন রাবওয়ায় তালিমুল ইসলাম কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়।

**বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি স্থাপন**

হযরত খলীফাতুল মসীহ-সানী (রা.)-এর যেমন আধ্যাত্মিক ব্যাপারে তেমনি জাগতিক ব্যাপারেও গভীর অর্ন্তঃদৃষ্টি ছিল। তিনি তার স্বেচ্ছাসেবকদেরকে পরিচালিত করেন এবং শুদ্ধি বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেন। শুদ্ধি হল অন্য ধর্ম থেকে হিন্দু ধর্মে ফিরে আসা। আর্য্য সমাজের স্বামী স্বরদানন্দ (মহত্মা মুন্সিরাম) এই জোরপূর্বক প্রত্যাবর্তন (হিন্দুধর্মে) শুরু করেন। আহমদী স্বেচ্ছাসেবকগণ জনগণকে তাদের পূর্ব ধর্মবিশ্বাসে ফিরে আসতে পথ দেখান ও পরিচালিত করেন।

১৯৩০ এর দশকে কাশ্মির আন্দোলনের সময় সম্মানিত খলিফা (রা.) কাশ্মিরের মুসলমানদের মৌলিক সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

**রাবওয়া**

১৯৪৭ ইং সানে ভারত উপমহাদেশ বিভক্তির কঠিন সময়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ-সানী (রা.) জামা'তকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। বিভক্তির পর জামা'তের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কিছু দফতর লাহোরে স্থানান্তর করা হয়। যদিও তিনশত তের জন আহমদীর একটি দল (সংখ্যাটি সাদৃশ্যজনক ভাবে বদর যুদ্ধে মক্কার আক্রমনকারীদের পরাভূত করা মুসলিম সৈন্যদলের সমান) স্বেচ্ছায় কাদিয়ানের কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য থেকে যায়। কিছু সময় পরে আহমদীয়া জামা'ত ১০০০ একর অনুর্বর বিরান ভূমি লাভ করে, যেখানে পরে পাকিস্তানে জামা'তের কেন্দ্রীয় দপ্তর সমূহ স্থাপন করা হয়। শহরটির নাম করণ করা হয় 'রাবওয়া', যার ভিত্তি হযরত খলীফাতুল মসীহ-সানী (রা.)২০ শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ ইং সালে রাখেন।

পরবর্তী বৎসর ৩রা অক্টোবর ১৯৪৯ ইং তারিখে হযরত খলীফাতুল মসীহ-সানী (রা.) রাবওয়ার প্রথম মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। মসজিদের নির্ধারিত স্থানটি ছিল সেটাই যেখানে হযরত খলীফাতুল মসীহ-সানী (রা.) ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ ইং তারিখে প্রথম নামাজ

আদায় করেন। কয়েক বছরে একদা অনুর্বর অঞ্চল একটি সবুজ ও কর্মব্যস্ত শহরে পরিণত হয়। ১৯৫৬ ইং সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ-সানী "রবওয়ায় ফজল-ই-উমর হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। হাসপাতালের নির্মাণ কাজ পরবর্তী দুই বৎসরে সম্পন্ন হয়, এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ-সানী (রা.) ২১ শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ ইং তারিখে উদ্বোধন করেন। হাসপাতালের সুবিধা সমূহ ক্রমান্বয়ে বর্ধিত ও উন্নত হয়ে চলেছে।

**ওয়াকফে জাদীদ**

২৭ শে ডিসেম্বর ১৯৫৭ ইং তারিখে হযরত খলীফাতুল মসীহ-সানী (রা.) তাহরীকে ওয়াকফে জাদীদ (নব উৎসর্গ) এর ঘোষণা দেন। এই তাহরীকের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী জামা'তের সদস্যদের আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮ ইং মাসে ১৪ জন মোয়াল্লেম (প্রশিক্ষক) কে দেশের নির্বাচিত গ্রামাঞ্চলে পাঠানো হয়। বর্তমানে যাহার সংখ্যা কয়েক হাজার পৌঁছেছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ-সানী (রা.) ওয়াকফে জাদীদের প্রথম পরিচালক (নাযেম ইরশাদ) হিসাবে হযরত সাহেবজাদা মির্যা তাহের আহমদ (যিনি পরবর্তীতে খলীফাতুল মসীহ-৪র্থ নির্বাচিত হন) কে নিয়োগ দেন।

**ইউরোপ মহাদেশ পরিদর্শন, ১৯৫৫ ইং**

১৯৫৫ ইং সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ-সানী (রা.) ইউরোপ ভ্রমনে যান এবং জামা'তের বিভিন্ন ইউরোপীয় মিশন সমূহ পরিদর্শন করেন। উক্ত ভ্রমনে দামেস্ক ও লেবানন হয়ে জেনেভা, জুরিখ, হামবুর্গ এবং দি হেগ অন্তর্ভূক্ত ছিল। ২২,২৩ এবং ২৪ শে জুলাই ১৯৫৫ ইং তারিখে খলীফাতুল মসীহ-সানী (রা.) এর সভাপতিত্বে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় যেখানে আমেরিকান, ইংল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী, স্পেন, হল্যান্ড, নাইজেরিয়া এবং ত্রিনিদাদ এর মোবাল্লেগণ (মিশনারীগণ) প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

**বক্তৃতা এবং লেখনী**

তাঁর সুগভীর বুদ্ধিমত্তা এবং খোদাপ্রদত্ত জ্ঞান তাকে প্রায় ২০০টি পুস্তক লিখতে এবং অসংখ্য ভাষণ ও লেকচার প্রদান করতে সামর্থ্য প্রদান করে। হযরত খলীফাতুল মসীহ-সানী (রা.) এর লিখিত বহু বইয়ের মধ্য কয়েকটি হল: দাওয়াতুল আমীর, তা'ল্লুক বিল্লাহ, মিনহাজুত্তালেবীন, ইসলামী ইকতিসাদী কা নিযাম, নেযামে নও, সীরাতে খায়রুর রসুল, যিকরে ইলাহী। তা ছাড়া দ্বিতীয় খেলাফতের সময় পবিত্র কোরআনের গভীর বিশ্লেষণ সহ (পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাষ্য সহ) ১০ খণ্ডে বিস্তৃত অনুবাদ (তফসীরে কবীর) এবং অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত মন্তব্যসহ আরেকটি অনুবাদ (তফসীরে সগীর) প্রকাশিত হয়।

স্যার মুহম্মদ জাফরুল্লাহ খান তার পুস্তক "আহমদীয়াত দি রেনেইসান্স অব ইসলাম" পুস্তুকে লিখেন: "তিনি ব্যাপক বহুমুখী ক্ষমতা সম্পন্ন মানসিকতার অধিকারী ছিলেন, এবং তার বুদ্ধিবৃত্তির সীমা সমসাময়িক লোকজনের ভিতর ছিল অতুলনীয়। এই সমস্ত গুণাবলী তার বক্তৃতা ও লেখনীতে বিস্ময়কর ভাবে ফুটে উঠতো। ...তার বক্তৃতাসমূহ ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক ভূরিভোজ স্বরূপ যা উপস্থিত শ্রোতাদের গভীর আনন্দ ও উপভোগে পরিতৃপ্ত করতো। সেই ভূমিকায় তিনি তাদের ধীশক্তি-বুদ্ধিমত্তা উজ্জিবিত করতেন,তাদের মানসিক ক্ষমতা প্রাণবন্ত করতেন, নৈতিক-আধ্যাত্মিক উচ্চারোহনে উদ্দীপ্ত করতেন এবং তাদেরকে ব্যাপক মাত্রায় মানসিক ভাবে সমৃদ্ধি করে বাড়ী পাঠাতেন ..."

২৬ শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৯ ইং তারিখে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) ইসলামিয়া কলেজ হলে "মার্টিন হিসটোরিকাল সোসাইটি" আয়োজিত এক অনন্য সাধারণ মিটিং এ বক্তৃতা প্রদান করেন। লেকচারের বিষয় বস্তু ছিল "ইসলামের প্রথম যুগের ইতিহাসের একটি অধ্যায়: প্রাথমিক মুসলমানদের ভিতর মতানৈক্যের কারণ"। লেকচারের উর্দু সংস্করণের ভূমিকায় সৈয়দ আব্দুল কাদির, এম.এ, ইসলামিয়া কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক এবং সোসাইটির প্রেসিডেন্ট লিখেন: "হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, যিনি এক বিদ্বান পিতার বিদ্বান পুত্র, এর নামই লেকচারটি অত্যন্ত পান্ডিত্যপূর্ণ হওয়ার পর্যাপ্ত নিশ্চয়তা প্রদান করে। আমিও ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে কম-বেশি জানি। আমি কোন প্রকার মতানৈক্যের ভয় না রেখেই বলতে পারি যে, খুবই কম ঐতিহাসিক, সে মুসলমান হোক বা অমুসলমান, হযরত ওসমান (রা. ) এর সময়কার বিবাদের প্রকৃত কারণ আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছে। হযরত মির্যা সাহেব কেবল মুসলমানদের ভিতর প্রথম গৃহযুদ্ধের সত্যিকারের কারণ তথ্যানুসন্ধামে বের করতে সফল হন নাই, বরং সহজ বোধ্য ও জীবন্ত ভাবে ঐ সমস্ত ঘটনার বর্ণনা করেছেন যা খেলাফতের প্রাসাদকে বহুবছর প্রকম্পিত করেছিল। আমি মনে করি, যারা ইসলামের ইতিহাসে আগ্রহী, তারা ইতিপূর্বে এরূপ যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা লাভ করেন নাই। সত্য এই যে যতই একজন ব্যক্তি মৌলিক ঐতিহাসিক কাজ সমূহ অধ্যয়ন করবে ততই সে এই লেকচারের বিষয়বস্তুর সঠিক ভাবে মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবে।"

দ্বিতীয় খেলাফতের সময় কাল প্রায় ৫২ বৎসর ব্যাপী বিস্তৃত ছিল। ১৩ই মার্চ ১৯১৪ ইং থেকে ৮ই নভেম্বর ১৯৬৫ ইং পর্যন্ত। হযরত খলীফাতুল মসীহ-সানী (র.) এর উদ্দিপনাময় বক্তৃতা, খোতবা ও ভাষণসমূহ জামা'তের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মানদণ্ড উন্নীত করতে সহায়ক হয়। তিনি সকল সদস্যদের ব্যাপারে অকৃত্রিম ও ব্যক্তিগত অনুরাগ রাখতেন। পবিত্র কোরআনে তার আনুপুঙ্খিক ও অগাধ জ্ঞান ছিল, যা পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যায় তফসীরের কবীর (বৃহত্তর ব্যাখ্যা) এবং তফসীরে সগীর (সংক্ষিপ্ততর ব্যাখ্যা) এ সমুজ্জ্বল ভাবে ফুটে উঠেছে। তফসীরদ্বয় দ্বিতীয় খেলাফতের সময়ে প্রকাশিত হয়, যা গভীর জ্ঞান ও অর্ন্তদৃষ্টির ধনভান্ডার স্বরূপ কাজ করছে। তার জীবনের শেষ পর্যন্ত জামা'তের সদস্যদের মঙ্গলের প্রতি সার্বক্ষণিক উৎসাহ প্রদান অব্যাহত ছিল। ১০ই মার্চ ১৯৫৪ ইং তারিখে একজন নুতন বয়আতকারী কর্তৃক হযরত খলিফাতুল মসীহ-সানী (রা.) ছুরি দিয়ে গলায় আক্রান্ত হন। তাহার দুর্বল ও নাজুক স্বাস্থ্য এবং এই মারত্মক আঘাত সত্বেও, তিনি তফসিরে কবীর সম্পন্ন করার কাজ চালিয়ে যান, যদিও মাঝে মাঝে নামাজে ইমামতী করতে সমর্থ হতেন না। তিনি ১৯৬৫ ইং সালের ৮ই নভেম্বর ও ৯ই নভেম্বরের মাঝের রাতে, রাতের শেষ সময়ে ইন্তেকাল করেন।

স্যার মুহম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেবের লেখনি মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে: "এলহামে উল্লেখিত বিভিন্ন মুখী একগুচ্ছ ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা কোন সন্দেহের ছায়ারও অবকাশ রাখে না যে, ভবিষ্যদ্বাণীগুলি মহান আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে করা হয়েছিল। উক্ত এলহামের পূর্ণতা আল্লাহ্ তা'লার আস্তিত্ব ইসলামের মহানবী (সা.) এর সত্যতা, পবিত্র কুরআনের স্বর্গীয় উৎস, প্রতিশ্রুত মসীহ এর সত্যতা, হযরত খলীফাতুল মসীহ-সানী (রা.) এর ন্যায়নিষ্ঠতা এবং তিনি যে প্রতিশ্রুত মসীহ এর স্বর্গীয় ভাবে নিয়োগকৃত উত্তারাধিকারী তা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে। তার অনন্যসাধারণ গুণাবলী, মানুষ্য প্রচেষ্টার এত বেশী অঞ্চলে তার সুউচ্চ অর্জনসমূহের আশ্চর্য্যজনক রেকর্ড, যার সবকিছুই ছিল ধর্মের পুনরুজ্জীবন এবং সকল ধর্মের ওপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার, সাম্প্রতিক সময়ে ইসলামের নবজাগরনের বর্ষপুঞ্জীতে তাকে অবিস্বরণীয় মহান, সমুজ্জ্বল ও অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে সুনির্দিষ্ট করেছে।"

***(প্রবন্ধটি "রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স" ফেব্রুয়ারী ২০০৮ ইং সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ।)***

# “বিভিন্ন ধর্মের আলোকে ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন ও তাঁর সত্যতা”

মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা’লা বলেন, “আর স্মরণ কর আমরা যখন নবীদের কাছ থেকে তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তোমার কাছ থেকেও। এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মরিয়ম-পুত্র ঈসার কাছ থেকেও অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। আর আমরা এদের সবার কাছ থেকে এক দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম।” (সূরা আহযাব-৮)

ইমাম মাহদীর আগমন হবে এটা ইসলাম ধর্মে সর্বজন স্বীকৃত একটি বিষয়। বিগত চৌদ্দশ’ বছরে মুসলমানদের মাঝে অনেক দলাদলি হয়েছে, ফির্কাবাজী হয়েছে, শতশত ফির্কার জন্ম হয়েছে। হাজারো মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু শেষ যুগে ইমাম মাহদী আসবেন এ বিষয়ে কারো মাঝে তেমন কোন মতভেদ নেই বললেই চলে।

শুধু মুসলমানরা নয়। প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরাই বিশ্বাস করে শেষ যুগে একজন মহাপুরুষ আসবেন। ইহুদীরা বলে শেষ যুগে মসীহ আসবেন। খ্রিষ্টানরা বলে, না! মীসহ একবার এসে গেছেন। শেষ যুগে তার দ্বিতীয় আগমন হবে। বৌদ্ধরা বলে, না, শেষ যুগে মৈত্রিয়া বুদ্ধ আসবেন। হিন্দুরা বলে না, শেষ যুগ কলির যুগ। এ যুগে কল্কি অবতার আসবেন।

এক কথায় প্রত্যেক ধর্মই শেষ যুগে একজন মহাপুরুষের আগমন প্রত্যাশী। আমরা যারা আহমদী- আমরা আমাদের জামাতের মহান প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে ইমাম মাহদী হিসেবে মান্য করি। তার সাথে সাথে এটাও বিশ্বাস করি- বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা শেষ যুগে যে মহাপুরুষের আগমনের প্রতিক্ষায় রয়েছে তিনিই সেই মহাপুরুষ। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন-

“শেষে এটাও স্পষ্ট করা আবশ্যক। এ যুগে আমি কেবল মুসলমানদের সংশোধনের জন্যই আসিনি। আমি মুসলমান, হিন্দু ও খ্রিষ্টান এই তিন জাতির সংশোধনের জন্যই আগমন করেছি। যেভাবে খোদা তা’লা আমাকে মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী হিসেবে প্রেরণ করেছে। ঠিক সেভাবে হিন্দুদের জন্য আমি অবতার হিসেবে আগমন করেছি।” (লেকচার সিয়ালকোট)

আর আল্লাহ তা’লাও শেষ যুগে আগমনকারী এক জনের বিষয়েই মহানবী (সা.)ও সব নবীদের কাছ থেকে অঙ্গীকারও নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা’লা বলছেন-আর স্মরণ কর আমরা যখন নবীদের কাছ থেকে তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তোমার কাছ থেকেও। এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মরিয়ম-পুত্র ঈসার কাছ থেকেও অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। আর আমরা এদের সবার কাছ থেকে এক দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। (সূরা আহযাব-৮)

এ তাই ধর্মের ভিন্নতার কারণে নাম যতই ভিন্ন ভিন্ন হোক। শেষ যুগে আগমনকারী মহাপুরুষ মূলত একজনই। আর তিনি হলেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। ইতিমধ্যে তাঁর আগমনও হয়ে গেছে।

ইনশাআল্লাহ। আমি তাঁর আগমন ও সত্যতার বিষয়টি কুরআন হাদীসের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মের আলোকেও সাব্যস্ত করার চেষ্টা করবো।

## আগমনের সময়কাল

### ক) ইসলাম ধর্মের বক্তব্য

শুরুতেই বলেছি ইমাম মাহদী আসবে এ বিষয় নিয়ে মুসলমানদের মাঝে কোন বিরোধ নেই। বিরোধ হলো- কবে আসবে এটা নিয়ে? তবে এ বিষয়েও বিরোধ করার তেমন একটা অবকাশ নেই, সুযোগ নেই। কারণ তেরশ’ বছর পর ইমাম মাহদী আসবে এ বিষয়টি কুরআন হাদীসে পূর্বেই সুনির্দিষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা’লা পবিত্র কুরআনে বলছেন- “তিনি (আল্লাহ) আকাশ হতে পৃথিবীতে (কুরআনী শরিয়ত প্রতিষ্ঠার) ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। এরপর তা একদিনে তাঁর দিকে উঠে যাবে। যা তোমাদের গণনায় হাজার বছর।” (সূরা আস সিজদা-৬)

কুরআনী শরিয়ত এক হাজার বছরে আকাশে উঠে যাবে। তবে এই উঠে যাওয়ার যুগটা কখন থেকে শুরু হবে এ বিষয়ে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) বলেছেন-আমার শতাব্দী সর্বোৎকৃষ্ট, এরপর এর সন্নিহিতগণের এরপর এর সন্নিহিতগনের। তারপর মিথ্যার বহি:প্রকাশ হবে। (সুনানে নিসাই ও মিশকাত শরীফ)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এবং সাহাবীদের শতাব্দী, এরপর তাবেঈনদের শতাব্দী, এরপর তাবে তাবেঈনদের শতাব্দী মোট তিন শতাব্দী, তিনশত বছর হলো সর্বোৎকৃষ্ট যুগ। এরপর শুরু হবে মিথ্যার

যুগ,অন্ধকারের যুগ। তখন কুরআন ও কুরআনী শিক্ষা আকাশে উঠে যাওয়া শুরু হবে। এর ব্যাপ্তি হবে এক হাজার বছর। ১০০০ বছর + ৩০০ বছর অর্থাৎ মোট তেরশত বছর অতিক্রান্ত হবার পর যখন কুরআন আকাশে উঠে যাবে অর্থাৎ ঈমান আকাশে চলে যাবে তখন এই হারানো ঈমানকে ফিরিয়ে আনার জন্য ইমাম মাহদীর আগমন হবে। মহানবী (সা.) হযরত সালমান ফার্সী (রা.)-এর কাধে হাত রেখে বললেন-

যদি ঈমান সূরাইয়্যা নক্ষত্রেও চলে যায়। তবুও আল্লাহ্ তা'লা এদের বংশধর হতে অর্থাৎ পারশ্য বংশ থেকে এক বা একাধিক ব্যক্তির আগমন ঘটাবেন এই হারানো ঈমানকে ফিরিয়ে আনার জন্য। (বুখারী শরীফ, কিতাবুত তফসীর)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর বংশ পারস্যবংশীয়। ঠিক তেরশ' বছর পরই ১৩০৬হিজরী সনে মসীহ ও মাহদী হিসাবে আত্মপ্রকাশ হয়েছেন।

## খ) খ্রিষ্টধর্মের বক্তব্য

এবার একটু দেখে নেয়া যাক অন্যান্য ধর্মগুলো এ বিষয়ে কি বলে ? শেষযুগে আগমনকারী মহাপুরুষের আগমনকাল সম্পর্কে বাইবেলেরও একই বক্তব্য। শুনলে অবাক হবেন হয়তো। সময়কাল সম্পর্কে বাইবেলে বলা হয়েছে- "সেদিন থেকে নিয়মিত উৎসর্গ বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং সর্বনাশা ঘৃণার জিনিষ স্থাপন করা হবে সেই দিন থেকে হাজার দু'শো নব্বই দিন হবে। সেই লোক ধন্য যে অপেক্ষা করে এবং একহাজার তিনশো পয়ত্রিশ দিন পর্যন্ত স্থির থাকে।" (দানিয়েল ১২:১১-১২)

বলা হয়েছে- সেদিন থেকে নিয়মিত উৎসর্গ বন্ধ করে দেওয়া হবে অর্থাৎ মানুষ ধর্মকর্ম ছেড়ে দিবে। সর্বনাশা ঘৃণার জিনিস স্থাপন করা হবে অর্থাৎ যুদ্ধবিগ্রহ, হানাহানি শুরু হবে। আর ঠিক এই যুগই এমন এক যুগ, যে যুগে মানুষ ধর্মকর্ম ছেড়ে দিয়েছে। ধর্মের প্রতি মানুষের ভক্তি অনুরাগ কমে গেছে। নাস্তিকতা বেড়ে গেছে। বিশেষভাবে খ্রিষ্টানদের ক্ষেত্রে আজ এটা শতভাগ সত্য। যুদ্ধবিগ্রহ হানাহানিও বেড়ে গেছে।

আর এই যুগেই হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর আগমন হয়েছে। বাইবেলে যেভাবে বলা হয়েছিল- 'সেই দিন থেকে হাজার দু'শো নব্বই(১২৯০) দিন হবে। সেই লোক ধন্য যে অপেক্ষা করে এবং একহাজার তিনশো পয়ত্রিশ দিন পর্যন্ত স্থির থাকে।' ঠিক ১২৯০ হিজরীতেই তিনি প্রথম ইলহাম লাভ করেছিলেন। তাঁর আত্মপ্রকাশ ও বিকাশ ১২৯০ থেকে ১৩৩৫ সালের মধ্যেই হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন- "এটা আশ্চর্যজনক ঘটনা। আমি এটাকে খোদা তা'লার একটি নিদর্শন মনে করি। ১২৯০ হিজরীতেই খোদা তা'লার পক্ষ হতে এই বিনীত বান্দা বাক্যালাপ ও সম্মোধনের মর্যাদা লাভ করেছিল। (হাকীকাতুল ওহী-১৬৪ পৃ.)

অর্থাৎ বিষয়টি প্রমাণিত, ইসলামের মত খ্রিষ্টধর্মও তেরশ' বছর পর একজন মহাপুরুষ আগমনের বিষয়ে একমত।

## গ) হিন্দুধর্মের বক্তব্য

হিন্দু শাস্ত্রে রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ও গৌতমবৌদ্ধ ছাড়াও আরও দু'জন অবতারের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী দেখতে পাওয়া যায়। একজন হলেন নরশিংস। আরবের নিবাসী, উটের আরোহী তিনি হবে। সহস্র সূর্যের জ্যোতি নিয়ে তিনি আগমন করবেন। তাঁর আগমনে বিশ্ব আলোকিত হবে। এরপর আবার অন্ধকার নেমে আসবে। কলি যুগের আগমন হবে। তখন কলি নামের জন্য, দূর করার জন্য কল্কি অবতার আসবেন। এই কলির কালের সময়টাকে শাস্ত্রে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে– সহস্র মেকং বর্ষানাং ততঃ কলিযুগং স্মৃতম অর্থাৎ কলিযুগের ব্যাপ্তি এক হাজার বছর। (মহাভারত বন পর্ব, অধ্যায়-১৮৭,শ্লোক-২৫)

আবার বলা হয়েছে- কলিযুগের ব্যাপ্তি এক হাজার বছর আর এর সন্ধ্যা একশ' বছর এবং এর সন্ধ্যাংশ একশ' বছর মোট বারশ' বছর। (মহাভারত বন পর্ব, অধ্যায়-১৮৭,শ্লোক-২৫-২৭)

এই বারোশ' বছর কলিরকাল অর্থাৎ অন্ধকার যুগ থাকবে। হাদীসে যাকে ইয়াযহিরুল কিযব-এর যুগ, মিথ্যার যুগ অর্থাৎ অন্ধকার যুগ বলা হয়েছে। এই যুগ অতিক্রান্ত হবার পর কলি নাশের জন্য, অন্ধকার দূর করে সত্যযুগ নিয়ে আসার জন্য জন্য কল্কি অবতারের আগমন হবে। তিনি এসে- পুনঃ কৃতযুগং কৃতা ধর্ম্মান সংস্থাপ্য পূর্ববৎ (কল্কি পুরাণ, ২য় অধ্যায়, শ্লোক-)

তিনি পুনরায় পূর্বেরমত ধর্ম প্রবর্তন করে সত্যযুগের আগমন ঘটাবেন। অর্থাৎ একটা যুগ বারশ' বছর অন্ধকার থাকার পর সেটা একজন অবতার অর্থাৎ কল্কি অবতারের আগমনের মাধ্যমে আবার অন্ধকার দূর হয়ে পূর্বের মত আলোকিত হবে।

## আগমন স্থল ও নাম পরিচয়

## ক) ইসলাম ধর্মের বক্তব্য

সময়ের বিষয়টি যেভাবে পূর্বেই কুরআন হাদীস ও বিভিন্ন ধর্মের পবিত্র গ্রন্থে বলা হয়েছে ঠিক সেভাবে আগমনস্থল সম্পর্কেও বলে দেয়া হয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন- শুভ্র মিনারের কাছে দামেস্কের পূর্বে দিকে তাঁর আগমন হবে। (মুসলিম শরীফ, কিতাবুল ফিতন,বাব ফি যিকরে দাজ্জাল)

ওয়াল্ড ম্যাপ দেখলে দেখবেন দামেস্কের সোজা পূর্ব দিকেই ভারতের পাঞ্জাবের কাদিয়ান। আর এখানেই হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর জন্ম।

তবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা(স.) দামেস্কের পূর্ব দিকের ঐ দেশটি- কোন দেশ, জায়গার নাম কি? মাহদীর নাম কি হবে? এ সর্ম্পকেও সুনির্দিষ্ট করে বলে গেছেন। হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর পুস্তক আত্তারিখে লিখেন- মহানবী (স.) বলেছেন, এক জামাত ভারতে জিহাদ করবে। তারা মাহদীর সাথে থাকবে। তাঁর নাম হবে আহমদ।

মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল ও সুনানে নিসাই শরীফেও এ হাদীসের উল্লেখ রয়েছে। সেখানে শুধু মাহদীর জায়গায় ঈসা ইবনে মরিয়ম শব্দ ব্যবহার হয়েছে। বলা হয়েছে-ভারতে একটি দল জিহাদ করবে। তাদের সাথে ঈসা ইবনে মরিয়ম থাকবেন।

এই হাদীসগুলো থেকে এটা স্পষ্ট, প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী ভারতে আসবেন। আর তাঁর নাম হবে আহমদ।

তবে শেষ যুগে আগত এই ঈসা ইবনে মরিয়ম ও ইমাম মাহদী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি,নাকি একই ব্যক্তি -এ প্রশ্নও কারো মনে জাগতে পারে ?এর উত্তর হলো- একই ব্যক্তি। এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রিয় নবী হযরত

মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে গেছেন- ঈসা ইবনে মরিয়ম ছাড়া আর কোন মাহদী নেই। (ইবনে মাযা, বাব সিদ্দাতুজ জামান) অর্থাৎ ঈসা ইবনে মরিয়ম ও ইমাম মাহদী শেষযুগে আগত মহাপুরুষ আহমদ -এরই দুটি নাম মাত্র, ব্যক্তি একজনই।

ভারতে আগমনকারী এই আহমদ নামের প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী কোন স্থানে আসবেন এটাও বলে দেওয়া হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন- রসূল (সা.) বলেছেন- ইমাম মাহদী যে স্থানে আবির্ভূত হবেন এর নাম হবে কারা। (বিহারুল আনওয়ায়, খ - ১৩, পৃ- ২৩) 'কারা' বলা হয় পাঞ্জাব ও সিন্ধুর মিলিত অংশকে। এই এলাকায় কারাকোরাম নামে এক বিস্তৃত পর্বতও রয়েছে।

আর ৮৪০ হিজরীতে লেখা পুস্তক যাওয়াহিরুল আসরারের ৫৬ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে মহানবী (সা.) এটাও বলেছেন- ইমাম মাহদী যে স্থানে আবির্ভূত হবেন এর নাম হবে কাদা।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ(আ.)এর জন্ম কাদিয়ানে। কাজী সাহেবের গ্রাম হিসাবে এর নাম ছিল ইসলামপুর কাদা বা কাযা। আরবীতে দোয়াদকে দোয়া ও যোয়া দুই উচ্চারণেই পড়া হয়। ইসলামপুর কাদা সংক্ষিপ্ত হয়ে কাদা পরে এটা কাদিয়ান হয়েছে।

এই কাদিয়ান জায়গাটা কেমন হবে এর বর্ণনায় আল্লাহর প্রিয় হাবীব (সা.) বলে গেছেন- ইমাম মাহদী নদী অববাহিকার স্থান থেকে আবির্ভূত হবেন। আর জমিদার বংশীয় হবেন। (আবু দাউদ, কিতাবুল মাহদী)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) যিনি মসীহ ও মাহদী হবার দাবী করেছেন, তিনি ভারতের পাঞ্জাবের কাদিয়ানে জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। পাঞ্জাব পঞ্চ নদের অববাহিকার দেশ্। কাদিয়ান পাঞ্জাবের বিখ্যাত নদী বিপাশার অববাহিকায় অবস্থিত।

### খ) খ্রিষ্টধর্মের বক্তব্য

মসীহর দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কেও বাইবেলে বলা হয়েছে তাঁর আগমন পূর্ব দিক থেকে হবে। বলা হয়েছে- "বিদ্যুৎ যেমন পূর্বদিক থেকে নিগর্ত হয়ে পশ্চিম দিক পর্যন্ত প্রকাশ পায় তেমনি মনুষ্য পুত্রের আগমন হবে।" (মথি ২৪:২০)

উপরের উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট মসীহর দ্বিতীয় আগমন পূর্বদিকের কোন এক দেশে হবে। আর তাঁর নাম সম্পর্কে বলা হয়েছে- "আমি তোমাদের বলছি, যে পর্যন্ত না তোমরা বল যে, যিনি প্রভুর নামে আসছেন তার গৌরব হোক। সেই পর্যন্ত আর তোমরা আমাকে দেখতে পারবে না। (মথি ২৩:৩৯)

"তোমাদের সাথে থাকতে থাকতেই এইসব কথা আমি তোমাদের বলছি। সেই সাহায্যকারী অর্থাৎ পবিত্র আত্মা যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠিয়ে দিবেন, তিনিই সব বিষয়ে তোমাদের শিক্ষা দিবেন, আমি তোমাদের যা কিছু বলেছি সেই সব তোমাদের মনে করিয়ে দিবেন।" (যোহন ১৪:২৫-২৬)

অর্থাৎ শেষ যুগে মসীহ নিজে আসবেন না। তাঁর নামে একজন, অর্থাৎ মসীহ নাম নিয়ে একজন আসবেন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)ও মসীহ হওয়ারই দাবিই করেছেন।

### গ) বৌদ্ধধর্মের বক্তব্য

একইভাবে মহামতি গৌতম বুদ্ধও শেষযুগে একজন মৈত্রিয়া বা মসীহার আগমনের সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। ভাষা ও ভৌগলিক অবস্থানগত ভিন্নতার কারণে উচ্চারণগত সামান্য পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে মাত্র। তবে মৈত্রিয়া বা মসীহা শব্দ দুটি একই। বৌদ্ধদের পবিত্র গ্রন্থ ত্রিপিটকের দিঘা নিকায়ায় (সীলং সোর্স) বলা হয়েছে-বুদ্ধের প্রধান শিষ্য- "আনন্দ বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন- "আপনার তিরোধানের পর কে আমাদেরকে শিক্ষা দিবে? বুদ্ধ বললেন, আমিই একমাত্র প্রথম ও শেষ বুদ্ধ নই। যথা সময়ে অন্য বুদ্ধ এ পৃথিবীতে আসবেন। যিনি হবেন পুত-পবিত্র, চূড়ান্তভাবে আলোকপ্রাপ্ত, সুগভীর জ্ঞান সম্পন্ন, কল্যাণকারী, মহাবিশ্ব সম্পর্কে অন্ত:দৃষ্টি সম্পন্ন, মানবজাতির জন্য অতুলনীয় এক অবিসংবাদিত নেতা এবং দৈবদূত মন্ডলী ও নশ্বর জগতের এক পরম গুরু। তিনি তোমাদের কাছে একই শ্বাশ্বত সত্যরূপ বাণীর প্রকাশ করবেন যা আমি তোমাদের কাছে করেছি। তিনি তাঁর ধর্ম প্রচার করবেন যার মূল দ্যুতিময়, চরম পরিণতিতে আলোকময় এবং লক্ষ্যের দিক দিয়ে মহিমান্বিত। তিনি এক পরিপূর্ণ ধর্মীয় জীবন ব্যবস্থার প্রচার করবেন যা হবে সামগ্রীকভাবে নির্ভূল ও খাঁটি। যা আমি তোমাদের কাছে ঘোষণা করেছি তাঁর অনুসারীর সংখ্যা হাজার হাজার হবে, যেখানে আমার অনুসারী সংখ্যা শতশত। আনন্দ জিজ্ঞেস করলেন- আমরা তাকে চিনবো কি করে? বুদ্ধ বললেন- তিনি মৈত্রিয়া নামে পরিচিত হবে।" (দি গসপেল অপ বুদ্ধা, বাই কেরাস, পৃ-৩৪৫)

অর্থাৎ আগমনকারী মহাপুরুষ মৈত্রিয়া বা মসীহা বলে পরিচিত হবেন। শুধু তাই নয়, বৌদ্ধ যেমন অহিংসার সত্যবাণী প্রচার করেছেন,তিনিও তেমনি করবেন। ভালোবাসার বাণী শুনাবেন। তিনি নিজের ধর্মপ্রচার করবেন না। তিনি আরেকজনের জ্যেতির্ময় ধর্ম প্রচার করবেন। তিনি পরিপূর্ণ ধর্মের প্রবর্তক হবেন না, প্রচারক হবেন। তার অনুসারী হাজার হাজার হবে।

এই সবগুলো শর্তই হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর ক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছে। তিনি অহিংসার বাণী, ভালোবাসার বাণী প্রচার করেছেন, তিনি ঘোষণা দিয়েছেন- গালিয়া শুনকে দোয়া দো/পাকে দুখ আরাম দো। তিনি ইয়াযাউল হারব অর্থাৎ যুদ্ধ রহিত করে- হানাহানি, রক্তপাত বন্ধ করেছেন। তিনি নিজের আনিত ধর্ম নয়, বরং মুহাম্মদ (সা.)-এর দাস ও তাঁরমসীহা বা মৈত্রিয়া হিসাবে তাঁর ধর্ম ইসলাম প্রচার করেছেন অর্থাৎ নিজের গুরুর ধর্ম প্রচার করেছেন।

(চলবে)

## কৃতি ছাত্রী

আমাদের মেঝো মেয়ে কানেতা তালাত চৌধুরী যুঁথী ২০১৫ ইং সালে এম.বি.বি.এস ফাইনাল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে খুলনা সরকারী মেডিকেল কলেজ হতে পাশ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সে ভবিষ্যতে উচ্চতর ডিগ্রী নেওয়ার আশা পোষণ করছে। মহান আল্লাহ্ তা'লা যেন তার আশা পূর্ণ করেন এবং দেশ ও জাতির সেবা করার তৌফিক দান করেন সেজন্য দোয়ার আবেদন করছি।

**বাবুল আহমদ চৌধুরী ও হামিদা বেগম**
উত্তরা, ঢাকা

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

# হযরত মৌলভী হেকীম নূরুদ্দীন (রা.)-এর নামে দ্বিতীয় বিয়ে প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লেখা পত্র

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্র পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা আপনার এবং আপনার নতুন স্ত্রীর মাঝে দাম্পত্য বন্ধন, ঐক্য ও ভালোবাসা সর্বাধিক বৃদ্ধি করুন এবং সৎ-সালেহ্ সন্তান-সন্ততি দান করুন, আমীন, সুম্মা আমীন। প্রথমা স্ত্রীরা সচরাচর এ ধরনের বিষয়াদিতে প্রকৃতিগত দুর্বলতার কারণে চরম সীমায় কুধাণার বশবর্তী হয়ে নিজেদের জীবন ও সুখ-শান্তির বিনাশ ঘটিয়ে থাকে।

**স্ত্রীদের ওপর তৌহীদের অকাট্য দলিল**

'ওয়াহ্‌দাহু-লাশরিক' হওয়া খোদার গুণ। কিন্তু স্ত্রীরাও কখনো শরীক পছন্দ করে না। এক বুযূর্গ বলেন, তাঁর প্রতিবেশী এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অনেক কঠোর ও কর্কশ আচরণ করতো। এক পর্যায়ে সে দ্বিতীয় বিয়ে করতে মনস্থ করলো। এতে সে স্ত্রী অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে স্বামীকে বললো, 'আমি তোমার সব যাতনা সহ্য করেছি কিন্তু এই দুঃখ আর সহ্য করা যায় না যে, তুমি আমার স্বামী হয়ে এখন দ্বিতীয় স্ত্রীকে আমার সঙ্গে শরীক করবে।' তিনি বলেন, 'তার সে কথা আমার হৃদয়ে বড়ই গভীর দাগ কাটলো, বেদনাত্মক প্রভাব বিস্তার করলো। আমি সে কথার সদৃশ বিষয় কুরআন করীমে খুঁজে দেখতে চাইলাম। তখন এ আয়াতটি খুঁজে পেলাম ঃ ওয়া ইয়াগফিরু মা দূনা যালিক।' (সূরা আন নিসা: ১১৭) এ (অর্থাৎ শরীক করা) ছাড়া আর সবই তিনি ক্ষমা করেন-অনুবাদক।

এ বিষয়টি বাহ্যত বড়ই নাজুক। দেখা যায়, পুরুষের আত্মমর্যাদাভিমান যেমন চায় না যে, তার স্ত্রী তার এবং অন্য কারও মাঝে ভাগাভাগী হোক, তেমনি স্ত্রীর মর্যাদাভিমানও চায় না, তার স্বামী তার এবং অপর কারও মাঝে বিভক্ত হোক। কিন্তু আমি খুব ভালোভাবে জানি, খোদা তা'লার শিক্ষায় কোন ত্রুটি নেই। এবং তা মানবপ্রকৃতি ও স্বভাব বিরুদ্ধও নয়। এ ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ গভেষণালব্ধ সত্য এটাই যে, পুরুষের মর্যাদাভিমান এমন এক প্রকৃত বাস্তব ও পরিপূর্ণ মর্যাদাভিমান, যা আলাদা বা বিচ্ছিন্ন হলে প্রকৃতপক্ষেই এর কোন প্রতিকার নেই। কিন্তু স্ত্রীর মর্যাদাভিমান পূর্ণাঙ্গ নয়, বরং সম্পূর্ণ সন্দেহাত্মক এবং ক্ষিয়মাণ।

**মা'রেফতের গুঢ়তত্ত্ব**

এ ক্ষেত্রে সেই গুঢ়তত্ত্ব যা মহানবী (সা.) উম্মে সালমা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বলেছিলেন তা এক মা'রেফাত (তত্ত্বজ্ঞান) প্রদানকারী গুঢ়তত্ত্ব বিশেষ। কেননা মহানবী (সা.)-এর প্রস্তাব দিলে হযরত উম্মে সালমা রাযিয়াল্লাহু আনহা যখন এ ওজর-আপত্তি জানালেন, 'আপনার একাধিক স্ত্রী রয়েছেন এবং ভবিষ্যতে আরও হবে বলে খেয়াল আছে আর আমি একজন আত্মমর্যাদাভিমানী এমন নারী, যে দ্বিতীয় কোন স্ত্রী সইতে পারে না।' তখন মহানবী (সা.) বলেছিলেন, আমি তোমার জন্য দোয়া করবো, যেন খোদা তা'লা তোমার এই মর্যাদাভিমান দূর করে দেন এবং ধৈর্য দান করেন।'

কাজেই আপনিও দোয়ায় মশগুল থাকুন। নতুন স্ত্রীর মনোরঞ্জন অত্যাবশ্যক। কেননা সে হচ্ছে মেহমানের মত। তার ক্ষেত্রে আপনার আখলাক ও সদ্ব্যবহার উচ্চতর পর্যায়ের হওয়া দরকার। তার সাথে আপনি অকৃত্রিম মেলা-মেশা ও সহবাস করুন এবং আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর কাছে চান, তিনি যেন নিজ অনুগ্রহে তার সাথে আপনার নির্মল-নিখাদ ভালোবাসা ও প্রেমভরা সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেন। কেননা এসব কিছুই আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর আয়ত্তাধীন। এখন তার সাথে বিয়ের মাধ্যমে আপনার এক নতুন জীবন শুরু হয়েছে। আর যেহেতু মানুষ জগতে চিরকালের জন্য আসে নি, কাজেই ভবিষ্যত বংশগত বরকত ও আশিস প্রকাশিত হওয়ার জন্য এখন এ সম্পর্কের ওপরই সব আশা-ভরসা। খোদা তা'লা আপনার জন্য এক মুবারক (আশিসমণ্ডিত) করুন। আমি এ মহল্লাবাসী বিশেষ ওয়াকেফহাল ও গোপন খবরাখবর জানা লোকদের কাছ থেকে এ মেয়েটির সম্পর্কে এ মর্মে অনেক প্রশংসা শুনেছি যে, সে স্বভাবত সৎ পুণ্যবতী, সতী-সাধ্বী ও প্রশংসনীয় সদ্‌গুণাবলীর আধার। তার তরবিয়ত ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রতিও লক্ষ্য রাখুন। আপনি তাকে নিজে পড়াবেন, কেননা তার সহজাত ক্ষমতা ও প্রতিভা অতি উত্তম বলে মনে হয়। বস্তুত আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর এটা অতি অনুগ্রহ ও ইহ্‌সান যে, তিনি এ জোড়া মিলিয়েছেন। নচেৎ যোগ্য ও সৎ মানুষের এ অভাব ও দুর্ভিক্ষ কালে এমনটি ঘটা অসম্ভব বিষয়াবলীরই অন্তর্ভুক্ত। আপনার পত্রটি থেকে কিছুই জানা গেল না, ২০ মার্চ ১৮৮৯ ইং পর্যন্ত ছুটি পাবেন কি না। আপনি যদি ২০ কি ২২ তারিখে আসেন অর্থাৎ রবিবার এখানে থাকেন তাহলে বাবু মুহাম্মদ সাহেবও আপনার সাথে দেখা করবেন। এ অধম ১৫ মার্চ, ১৮৮৯ ইং তারিখে দু' তিন দিনের জন্য হুশিয়ারপুর যাওয়ার ইচ্ছা রাখে এবং ১৯ অথবা ২০ মার্চ তারিখে অবশ্যই ইনশাআল্লাহ্ ফিরে আসবে। সাহেযাদা ইফতিখার আহমদ এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজন সবাই কুশলে আছেন। গতকাল নগত সাত টাকা এবং কিছু কাপড় আমার জন্য পাঠিয়েছেন, যা তাঁর জোরালো অনুরোধের দরুন গ্রহণ করা হয়েছে। ওয়াস্‌সালাম

বিনীত
**গোলাম আহমদ**
(আল হাকাম, ৩১ মে, ১৯০৩, পৃষ্ঠা-৪)

# আমাদের কৃতকর্মের জন্যই আসে ঐশী আজাব

মাহমুদ আহমদ সুমন

গত এপ্রিলের শেষের দিকে বাংলাদেশসহ বেশ কয়েকটি দেশে ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে আর এতে নেপালে প্রায় ৮ হাজারের মত মানুষকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। আমাদের দেশে প্রায় প্রতি বছরই কম বেশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হানা দেয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কখনো এমনভাবে ধেয়ে আসে যার ফলে গ্রামের পর গ্রাম তছনছ করে দিয়ে চলে যায়। আর এসব যেমন ভূমিকম্প, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো ইত্যাদি দুর্যোগ প্রাকৃতিক, মানুষের এতে কোন হাত নেই। এধরণের দুর্যোগ মহান খোদা তা'লা যেকোন দেশে এবং যেকোন শহরে যেকোন মুহূর্তে ঘটাতে পারেন। এমন এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধ্বংস লিলার দৃশ্য গত এপ্রিলে আমরা অবলকোন করেছি। কেউ বলতে পারি না কোন সময় নেপালের মত এমন ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকারে পরিণত হতে যাচ্ছি। তাই এসব প্রাকৃতিক আজাব থেকে যেন খোদা আমাদের নিরাপদ রাখেন এজন্য সব সময় দোয়া করা উচিৎ।

এই যে একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ ধেয়ে আসছে এসব আসলে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে সতর্ক সংকেত। খোদা সতর্ক করছেন যে তোমরা সহজ সরল পথ অবলম্বন কর। সমাজ ও দেশের বেশির ভাগ মানুষ যখন পাপ, ব্যাভিচার, অন্যায় এবং খোদাকে ভুলতে বসে তখনই খোদা তা'লা তার পক্ষ থেকে কোপগ্রস্থ হয়ে শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌পাক বলেন, 'আর তোমাদের কৃতকর্মের কারণই তোমাদের ওপর বিপদ নেমে আসে। অথচ তিনি অনেক কিছুই উপেক্ষা করে থাকেন' (সূরা আশ শুরা: ৩১)। 'এমন কোন জনপদ নেই যা আমরা কেয়ামতের আগে ধ্বংস না করব, অথবা অতি কঠোর আযাব দিব' (সূরা বনী ইসরাঈল: ৫৯)। আল্লাহ্ তা'লার উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী আজ আমরা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হতে দেখছি। যে সকল আজাব আমরা প্রত্যক্ষ করছি, তা কেয়ামত তথা মহাধ্বংসের পূর্বলক্ষণ স্বরূপ প্রকাশিত হচ্ছে। আর এসব পবিত্র কুরআন তথা ইসলামের সত্যতার

জলন্ত নিদর্শন বহন করছে। খোদা তা'লা পরম করুণাময়, তিনি কোন জাতিকে সাবধান না করে কখনও আজাব অবতীর্ণ করেন না। যেভাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন, 'আমরা সতর্ক করার জন্য রসূল প্রেরণ না করে কখনও আজাব অবতীর্ণ করি না' (বনী ইসরাঈল: ১৬)। তারপর আবার উল্লেখ রয়েছে 'নূহের পর আমরা কত প্রজন্মকেই ধ্বংস করেছি। আর তোমার প্রভুপ্রতিপালক তার বান্দাদের পাপের খবরাখবর রাখার ক্ষেত্রে এবং পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে যথেষ্ট' (সূরা বনী ইসরাঈল: ১৮)।

আজাবের এমন একটি দিক নেই, যেদিক দিয়ে আজ পৃথিবী আক্রান্ত হয় নি। পৃথিবীর এমন কোন দেশ বা এমন কোন জাতি নেই যার ওপর আজাব না এসেছে, সে যত বড় শক্তিধর রাষ্ট্রই হোক না কেন। সকল প্রকার আজাবের প্রবল আক্রমণ মরণাহত মানবের ওপর বারবার এসে আঘাত হানছে। মানব প্রকৃতি বিকৃত হয়েছে। তার কারণে আল্লাহ্‌র রুদ্র রূপও প্রকাশিত হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে, কোন সতর্ককারী প্রেরণ না করে তিনি আজাব দেন না, পৃথিবীবাসী যেহেতু আজ আল্লাহ্‌র সতর্ককারীর আহ্বানকে ভুলে বসেছে, তাই তিনি তার রুদ্র রূপের বহির্প্রকাশ দেখাচ্ছেন, মানুষ যেন সতর্ক হয় এবং খোদার শিক্ষানুযায়ী জীবন পরিচালনা করেন। খোদার পক্ষ থেকে শাস্তিস্বরূপ যখন কোন আজাব আসে তখন তা থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন রাস্তা থাকে না। যেভাবে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে 'তুমি বল, আল্লাহ্‌র হাত থেকে কে তোমাদের রক্ষা করতে পারে যদি তিনি তোমাদের কোন শাস্তি দিতে চান? অথবা তিনি যদি তোমাদের প্রতি কৃপা করতে চান তবে কে এ থেকে তোমাদের বঞ্চিত করতে পারে? আর তারা নিজেদের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন অভিভাবক বা কোন সাহায্যকারীও খুঁজে পাবে না' (সূরা আহজাব: ১৮)। আরো উল্লেখ রয়েছে 'আর আমরা যে জনপদেই কোন নবী পাঠিয়েছি এর অধিবাসীদেরকে আমরা অবশ্যই অভাব-অনটন ও দুঃখকষ্টে জর্জরিত করেছি যাতে করে তারা আকুতি-মিনতি করে। আবার আমরা তাদের মন্দ অবস্থাকে ভালো অবস্থায় বদলে দিলাম। অবশেষে তারা যখন প্রাচুর্য লাভ করলো এবং বলতে লাগলো, আমাদের পূর্বপুরুষদের বেলায়ও দুঃখ ও সুখ পালাক্রমে আসতো, তখন আমরা হঠাৎ তাদের ধরে ফেললাম এবং তারা তা বুঝতেও পারেনি। আর এসব জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো তাহলো আমরা নিশ্চয় তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর কল্যাণের দুয়ার খুলে দিতাম। কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করলো। সুতরাং তাদের কৃতকর্মের দরুন তাদেরকে আমরা ধরে ফেললাম। এসব জনপদের অধিবাসীরা কি এ ব্যাপারে নিরাপদ হয়েগেছে যে, রাতের বেলায় ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের ওপর আমাদের শাস্তি নেমে আসবে না? আর এসব জনপদের অধিবাসীরা কি এ বিষয়ে নিরাপদ হয়েগেছে যে, দুপুর বেলায় খেলাধূলায় মত্ত থাকা অবস্থায় তাদের ওপর আমাদের শাস্তি নেমে আসবে না? (সূরা আরাফ: ৯৫-৯৯)।

মহান আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীতে কেন আজাব-গজব পাঠান সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে। একটা বিষয় সবার অনুধাবন করা উচিৎ, কেন বার বার খোদা তা'লা আজাবের কথা উল্লেখ করলেন? তিনি যেহেতু রহমানুর রাহিম, তিনি চান না যে, তাঁর বান্দা কোনভাবে কষ্টে নিপতিত হোক। তাই তিনি বারবার সতর্ক করছেন, যেন তাঁর বান্দারা সঠিক পথে পরিচালিত হয়। কিন্তু যখন কোন জাতি তাঁর নির্দেশাবলির অমান্য করতে করতে সীমা ছাড়িয়ে যায় তখনই তাঁর পক্ষ থেকে কোন না কোন শাস্তি নিপতিত হয়।

এই যে সারা পৃথিবীতে একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ ধেয়ে আসছে এর একটাই কারণ, আর তা হলো রহমান খোদার বান্দারা আজকে সেই খোদাকেই ভুলে বসেছে, যিনি সবাইকে সৃষ্টি করেছেন আর এ কারণেই কোন দেশ আজ এমন নেই যারা বলতে পারবে যে, আমরা এসব প্রাকৃতিক আজাব থেকে নিরাপদ বা আমাদের দেশের কোন ক্ষতি হবে না। শক্তিশালী জাপানও এসব প্রাকৃতিক আজাব থেকে রক্ষা পায়নি। যেভাবে এ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.) ১৯০৬ সালে জগদ্বাসীকে এসব প্রাকৃতিক দৈব-দুর্যোগের মহা বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন–

"মনে রেখ! খোদা তাআলা আমাকে সাধারণভাবে ভূমিকম্পের সংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং নিশ্চয় জেনো ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমেরিকায় যেমন ভূমিকম্প এসেছে, সেরূপ ইউরোপেও এসেছে এবং এশিয়ার বিভিন্ন এলাকায়ও আসবে। এদের মধ্যে অনেকগুলো কেয়ামত সদৃশ হবে এবং এরূপ মৃত্যু সংঘটিত হবে যে, রক্তের স্রোতধারা প্রবাহিত হবে। এ মৃত্যু হতে পশু পাখিও রক্ষা পাবেনা। পৃথিবীতে এমন ধ্বংস দেখা দেবে যে, মানব সৃষ্টি অবধি এমন ধ্বংস কখনও আসেনি এবং অধিকাংশ স্থান ওলট পালট হয়ে যাবে; দেখে মনে হবে যেন সেখানে কখনও কোন জনপদ ছিল না। এর সাথে আকাশ ও পৃথিবীতে ভীতিপ্রদ অবস্থার সৃষ্টি হবে। এমনকি প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে এসব অস্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান হবে। জ্যোতিষ-শাস্ত্র ও দর্শনের পুস্তকে এর উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। তখন মানুষের মধ্যে এক চাঞ্চল্য দেখা দেবে যে, পৃথিবীতে একি হতে চলেছে? অনেকে রক্ষা পাবে এবং অনেকে বিনষ্ট হবে। সেদিন সন্নিকটে এবং তোমাদের দ্বারপ্রান্তে আমি তা দেখতে পাচ্ছি। দুনিয়া তখন কিয়ামতের দৃশ্য অবলোকন করবে। শুধু ভূমিকম্পই নয়, বরং আরো ভীতিপ্রদ বিপদাবলী দেখা দেবে, কিছু আকাশ হতে এবং কিছু ভূতল হতে। এটি এজন্য হবে যে, মানবজাতি আপন সৃষ্টিকর্তার উপাসনা ছেড়ে দিয়েছে এবং মন-প্রাণ ও শক্তি দিয়ে পার্থিব বিষয়ে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে। আমার আগমন না ঘটলে এসব বিপদাবলীর প্রাদুর্ভাবে কিছুটা বিলম্ব ঘটতো। কিন্তু আমার আগমনের মাধ্যমে খোদার ক্রোধ প্রদর্শনের সেই সুপ্ত বাসনা প্রকাশিত হয়ে গেছে-যা এক দীর্ঘকাল যাবৎ অন্তরালে ছিল।

আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন ঃ- "এবং আমরা (সতর্ককারী) রাসূল না পাঠিয়ে আযাব অবতীর্ণ করি না।" তবে অনুতাপকারীরা নিরাপদ থাকবে আর যারা বিপদ আগমনের পূর্বেই সাবধান হবে তাদের প্রতি দয়া প্রর্দশন করা হবে। তোমরা কি এসব ভূমিকম্প এবং বিপদাবলীর কবল থেকে নিজেদের নিরাপদ ভাবছ? কক্ষনো না। সেদিন সকল মানবীয় কার্যকলাপ নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রচন্ড ভূমিকম্প হয়েছে আর তোমাদের এদেশ এসব থেকে নিরাপদ-একথা মনে করোনা! আমি লক্ষ্য করছি, তোমরা সম্ভবত এর চেয়ে বেশী বিপদের সম্মুখীন হবে। ***হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নও। হে এশিয়া! তুমিও সুরক্ষিত নও। হে দ্বীপবাসীরা! কোন কৃত্রিম খোদা তোমাদের সাহায্য করবেনা। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি; জনপদগুলোকে জনমানবশূণ্য প্রত্যক্ষ করছি।*** সেই এক-অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবত নীরব ছিলেন

এবং তাঁর সামনে অনেক জঘন্য অন্যায় সংঘটিত হয়েছে আর তিনি নীরবে সব সয়ে গিয়েছেন। কিন্তু এখন রুদ্রমূর্তিতে তিনি স্বরূপ প্রকাশ করবেন। যার শোনার মত কান আছে সে শুনে নিক, সে সময় দূরে নয়। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্র করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্য সত্যই বলছি, এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। ***নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে আর লুতের দেশের ঘটনা তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে।*** তবে খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হবে। খোদাকে যে অভাগা পরিত্যাগ করে, সে মানুষ নয়, কীট। যে তাঁকে ভয় করেনা সে জীবিত নয়, বরং মৃত।" (হাকীকাতুল ওহী, বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ২১৪-২১৫)

এসব দুর্যোগ থেকে বাঁচার জন্য এখন একটিই রাস্তা খোলা আছে আর তাহলো মহান খোদা তা'লার প্রকৃত বান্দায় পরিণত হওয়া এবং আল্লাহ্ রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)-কে সত্যতা উপলব্ধি করে তাঁর খলীফার হাতে বয়আত করা, সেই সাথে আল্লাহর অধিকার এবং বান্দার অধিকার যথাযথ প্রদানও করতে হবে। এছাড়া যারা আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত বান্দা তাদের মুখ দিয়ে এসব ঐশী আজাবের সময় এই দোয়াই বের হয় 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, তাদের ওপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফেরাত ও রহমত আর তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত' (সূরা বাকারা: ১৫৮)। মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যখন কোথাও ভূমিকম্প সংঘটিত হয় অথবা সূর্যগ্রহণ, ঝড়োবাতাস বা বন্যা হয়, তখন মানুষের উচিত মহান আল্লাহ্‌র কাছে দ্রুত তওবা করা। তাঁর কাছে নিরাপত্তার জন্য দোয়া করা এবং তাঁকে অধিকহারে স্মরণ করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা' (মুসলিম)।

গত এপ্রিল/মে ২০১৫ পর পর কয়েক দিন আমাদের দেশসহ বিভিন্ন দেশে যে ভূমিকম্প হলো আমরা কি কেউ নিজের পাপের জন্য তওবা করেছি? রাস্তাঘাটে হাজার হাজার মানুষ ভূমিকম্প নিয়ে আলোচনা করছে, সবাই নিরাপদ স্থানে আশ্রয়ও নিয়েছে কিন্তু কেউ কি একথা ভেবেছে যে, এসব আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে সতর্কবার্তা। এছাড়া কোনো টিভি চ্যানেলেও আলেমদের এ নিয়ে তেমন কোন আলোচনা করতে দেখি নি বা শুনি নি আর মসজিদগুলোতে আলোচনা হয়েছে কি না বা কোথাও দু'রাকাত নফল নামায কেউ আদায় করেছেন কি না তাও আমার জানা নেই।

হায়! বার বার আল্লাহ্‌পাক আমাদের সতর্ক করছেন এরপরও যদি আমাদের হুশ না হয় তাহলে কি আমরাও আদ জাতি, সামুদ জাতিসহ অন্যান্য জাতিদেরকে যেভাবে তাদের অপকর্মের জন্য আল্লাহ্‌পাক ধ্বংস করেছেন আমরাও তার আহ্বান করছি? তাই সময় থাকতেই আমাদেরকে আমাদের দোষক্রটির জন্য পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্‌পাকের কাছে তওবা করতে হবে। মহান খোদা তা'লা আমাদেরকে তার আজাবের শাস্তি থেকে নিরাপদ রাখুন।

masumon83@yahoo.com

# মরহুমা মাহমুদা বেগম সাহেবার স্মৃতিকথা

**নিলুফার মমতাজ**

আল্লাহুম্মা সাল্লেআলা মুহাম্মদীন ওয়া আলা আলে মুহাম্মদদ ওয়া বারেক ও সাল্লাম ইন্নাকা হামীদুম মজিদ"।

চট্টগ্রাম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেবের বড় কন্যা মাহমুদা বেগম সাহেবা ২৪ শে সেপ্টেম্বর ২০১৪ ইং রাত ২.১০ মিনিটে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তিনি সরাইল নিবাসী মরহুম মীর সেকান্দর আলী সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র মরহুম মীর হাবিব আলী সাহেবের সাথে ১৯৩৬ সালে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন।

পুরুষরা যেমন এলেম-আমল, শিল্প-সাহিত্য ও বীরত্ব, তাকওয়া-পরহেজগারী ইত্যাদির ক্ষেত্রে অবদান রাখার কারণে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হন, ঠিক তদ্রুপ নারীগণও ইবাদত-বন্দেগী, পর্দা, তাকওয়া-তাহারাত ও শারাফতের কারণে প্রভূত মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হয়ে থাকেন। আমাদের আহমদীয়া জামা'তে আদর্শ জননী হিসাবে যে দশটি সোনালী তরবিয়ত নীতির মৌলিক শিক্ষা রয়েছে মরহুমা মাহমুদা বেগম সাহেবা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তা পালনে আজীবন সচেষ্ট থেকেছেন।

মরহুমা বেগম সাহেবা ৭ সন্তানের জননী- পাঁচ ছেলে, দুই মেয়ে। উনার বড় ছেলে অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী সাহেব বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত আর্কিটেক্ট। তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১ পদে অধিষ্ঠিত। দ্বিতীয় ছেলে ইঞ্জিনিয়র মীর শওকত আলী (বাসেত) জামা'তের একজন নীরব খাদেম এবং অন্যান্য সেবা প্রদানের পাশাপাশি চট্টগ্রাম মসজিদ বায়তুল বাসেত নির্মাণের ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁর অন্য ছেলেমেয়েরাও জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত।

মরহুমা মাহমুদা বেগম সাহেবা অত্যন্ত কোমল মনের মানুষ ছিলেন। আমার মনে হয় না উনি কখনও কারও মনে কষ্ট দিয়েছেন। স্বল্পতুষ্টি, সহিষ্ণুতা, সবর-ধৈর্য্য, সহনশীলতা এবং সর্বোপরি দোয়াই ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আহমদী জামাতের প্রতি তাঁর ছিল অগাধ ভালবাসা। উনি এমন এক ব্যক্তিত্বের অধিকারীনি ছিলেন যে কখনো নিজের স্বার্থের দিকে দেখেন নি। পরোপকার করাই যেন তার প্রধান লক্ষ্য ছিল। প্রকৃত ইসলাম তথা আহমদীয়তের প্রকৃত শিক্ষা, তরবিয়ত ও তাঁর অসাধারণ গুণাবলীর সমন্বয়ে তিনি তাঁর গোটা পরিবারকে আহমদীয়তের বন্ধনে বেঁধে রেখেছিলেন। উনার আরেকটি বিশেষ দিক, সাহায্যপ্রার্থী সবাইকে কোন না কোনভাবে সাহায্য করতেন। প্রতিবেশীদের প্রতি তিনি অত্যন্ত সহমর্মী ছিলেন। কাজের বুয়াদের সাথেও উনার ব্যবহার ছিল আন্তরিক।

আত্মীয়তার পরিমন্ডলে সবার সাথে উনার স্নেহের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। মরহুমা মাহমুদা বেগম সাহেবার শ্বশুর বাড়ীতে উনাকে সবাই "রাঙ্গাবউ" বলে ডাকত। আমার চাচাতো ভাই-বোনেরা সবাই আম্মাকে "রাঙ্গাচাচী" বলে ডাকত। এক কথায় বলতে

গেলে শ্বশুরবাড়ীতে সবাই আম্মার গুণমুগ্ধ ছিল। আম্মার আর একটা বিশেষ গুণ ছিল উনি সবসময় 'সদকা' দিতেন। আমরা ভাইবোনেরা যখন ঢাকায় পড়াশুনা করতাম ছুটিতে যখন বাড়ী আসতাম তখন আম্মাকে দেখেছি সদকা দিতে। কোন দু:সংবাদ শুনলে, অসুখে-বিসুখে সবসময় আম্মা সদকা দিতেন। তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায, নফল নামায, নফল রোযা আদায় করতেন। আমি আম্মাকে কখনও তাহাজ্জুদ মিস করতে দেখি নি। তিনি চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র একজন নীরব সেবক ছিলেন। তিনি কখনও বসে নামায পড়েন নি, অসুস্থতাতেও দাঁড়িয়ে নামায পড়তে বেশী পছন্দ করতেন।

আম্মা নিয়মিত জুমার নামায আদায় করতেন। আম্মা আমাদের বলতেন 'শুক্রবার' হচ্ছে ছোট ঈদ। শুক্রবার আম্মা ১২.৩০ মি: এর মধ্যে মসজিদে যেতেন এবং যিকরে ইলাহিতে রত থাকতেন। তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদের জুমুআর দিন ১২.৩০ টার মধ্যে মসজিদে যাওয়ার জন্য তাগিদ দিতেন। আম্মা তাঁর দোয়ার বরকতে আমাদের গোটা পরিবারে পরিপূর্ণ প্রশান্ত ও দ্বীনি পরিবেশ গড়ে তুলতে পেরেছিলেন।

মরহুমা মাহমুদা বেগম সাহেবা ছিলেন মানবদরদী। সাহায্যপ্রার্থী কেউ আমাদের বাসা থেকে কখনো খালি হাতে ফিরে যান নি। ২০০৫ সালে যখন আমি ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম আসি তখনকার একটি ঘটনা। কলিংবেলের শব্দ শুনে দরজা খুললাম। দেখি এক ভিক্ষুক দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে বললো, মা-কই বলেই ওমা ওমা করে ডাকছে। আম্মাকে দেখে বললো কিছু খেতে দিন আমাকে। আমি ক্ষুধার্ত। আম্মা বসতে বলে কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেই পরোটা, ডিম ও চা নিয়ে আসলেন এবং আপ্যায়ণ করলেন। এভাবেই আম্মা অসহায়দের সেবা করতেন। উনি সবসময় আমাদের বলতেন ভিক্ষুকরা আমাদের দরজায় এসেছে ওদেরকে 'মাফ কর'–একথা কখনো বলবেনা। কিছু না কিছু দিবে। খালি হাতে ফিরিয়ে দিবে না। আম্মা সবসময় দুটি পংক্তি আমাদের বলতেন–

"মিথ্যার জয় প্রতিদিন
সত্যের জয় একদিন"॥

তাছাড়া আরও একটি কবিতার লাইন উনি বলতেন–

চুরি করা বড় দোষ
মনে যেন রয়
না বলিয়া লইলে
চুরি করা হয়॥"

মেহমানদারী আম্মা খুব পছন্দ করতেন। আমার মনে আছে আমি তখন ছোট। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সময় তখন চট্টগ্রামে অনেক অবাঙ্গালী আহমদীরা ছিল। প্রত্যেক ঈদে আম্মা সকালে উঠে পোলাও-কোর্মা, সেমাই ও নানা রকম সু-স্বাদু খাবার রান্না করতেন। আঞ্জুমান থেকে সবাই ঈদের নামা পড়ে লাজনার বোনেরা সবাই আমাদের বাসায় আসতেন। আম্মা সবাইকে খুব যত্নসহকারে মেহমান নেওয়াজী করতেন। এই মেহমান নেওয়াজীতে আম্মা খুবই আনন্দ পেতেন।

বর্তমানে চট্টগ্রাম জামাতের অন্যতম বয়োজ্যেষ্ঠা ও প্রবীণতম সদস্যা মোহতরমা সৈয়দা আমাতুল মজীদ (ছুট্টি আপা) সাহেবা বর্ণনা করেন, ----"আমার আব্বা মরহুম সৈয়দ খাজা আহমদ সাহেব যখন বয়াত করেন তখন চট্টগ্রামে আহমদীদের মধ্যে একান্ত আপনজন বলতে আমরা প্রফেসর লতিফ সাহেবের পরিবারটিকে জানতাম, আমার বাবা বলেছিলেন আজ হতে সামসুন্নেসা বেগম সাহেবা আমার 'মা' আমরা তখন থেকেই সামসুন্নেসা বেগম (অর্থাৎ আমার নানী-লেখিকা) সাহেবাকে দাদী বলে ডাকতাম। উনার ছেলে গোলাম আহমদ খান (যগলু মিয়া)-কে কাকা ও উনার দুই মেয়ে মাহমুদা বেগম ও মোহসেনা বেগম সাহেবাকে বড় ফুফু ও ছোট ফুফু বলে ডাকতাম।

আসলে আমরা তো খৃস্টান থেকে আহমদী হয়েছিলাম। সত্যিকার অর্থে আহমদীয়াতের শিক্ষা বলতে যা বুঝায় আমরা তা কিছুই জানতাম না। সবকিছুই আমরা এই পরিবারের মাধ্যমেই শিক্ষা লাভ করেছি। বিশেষ করে বড় ফুফু (মরহুমা মাহমুদা বেগম সাহেবার) সাথে আমার হৃদ্যতা ছিল গভীর। আমার জীবনের প্রায় সবকিছুই যেমন-নামায, পর্দা করা, দোয়াদরূদ শিখা, সব বড়ফুফুর কাছ থেকে শিখেছি। বড় ফুফু আমাদের বলতেন এক তরকারী দিয়ে ভাত খাবে। আমরা তাহরীক জাদীদের চাঁদা দিয়ে থাকি। তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদ কি সেটাই আমরা জানতাম না তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের জ্ঞান আমরা বড় ফুফুর কাছ থেকে পেয়েছি।

সেই সময় বাংলায় এত বই ছিল না। সবকিছুই উর্দূ। আমার কাকা (ফালু মিয়া) আমাদেরকে আল ফযল পড়ে বাংলায় বুঝিয়ে দিতেন। বড় ফুফুর বাসায় যখন গিয়েছি কোনদিনও না খেয়ে আসতে পারি নি। সেই সময় চট্টগ্রাম জামাতে আহমদী পরিবারের মধ্যে যে ধরনের সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল সেটি আমাদের কাছে আহমদীয়াতের স্বর্ণযুগ বলে মনে হত। আমরা যখন ছোট তখন মোতালিব সাহেব (দরবেশ) তখন উনি যুবক, একবার চট্টগ্রামে এসেছিলেন তখন উনি ফুফুদের বাসাতেই ছিলেন। আমরা সেই সময় উনাদের মত বুযুর্গ ব্যক্তিদের সান্নিধ্য পেয়েছি। তখন আহমদী পরিবারগুলির মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিল অত্যন্ত গভীর ও আন্তরিক।"

মরহুমা মাহমুদা বেগম সাহেবার আরেকটি শখ ছিল গাছ লাগানো ও হাঁস-মুরগী পালন। উনি ফলের গাছ ও সবজী গাছ লাগাতেন। প্রতিদিন গাছগুলি নিজ হাতে পরিচর্যা করতেন। আম্মা যখন গাছের পরিচর্যা করতেন তখন মনে হত গাছগুলি আম্মার কথা শুনছে ও কথা বলছে আর উনি যখন হাঁসমুরগীকে খাওয়া দিতেন তখন দেখে মনে হত ঐগুলি উনার সন্তান। আম্মার হাতের লাগানো গাছগুলি এখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মৃত্যুর আগে উনি বলে গিয়েছেন গাছগুলির যত্ন নিও।

চট্টগ্রাম জামা'তের শতবর্ষপূর্তি হবে ২০১৬ সালে। চট্টগ্রাম জামা'তের প্রবীণ লাজনাদের মাঝে শুধু আম্মা ও ছুট্টি আপা ছিলেন। একজন চলে গেলেন আমার আম্মা। আছেন ছুট্টি আপা, দোয়া করি আল্লাহ্ তা'লা উনাকে শতবর্ষ দেখার শক্তি ও তৌফিক দেন। আর ১টি বছর যদি আম্মা পেতেন তা হলে চট্টগ্রামের এই শতবর্ষপূর্তি আম্মা দেখে যেতে পারতেন এবং আমাদের নিকট এই শতবর্ষ আরও বরকতময় হত। যাদের কুরবানী ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা শতবর্ষে পা দিতে চলেছি রাব্বুল আলামীনের দরবারে তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি এবং আল্লাহ্ তালা যেন তাঁদেরকে বেহেশতের উচ্চ মোকাম দান করেন।

পরিশেষে বলব মাতা পিতার জন্য প্রত্যেক সন্তানের দোয়া করা উচিত। মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে আমরা বিনীত প্রার্থনা, আল্লাহ্ তালা যেন আমার আম্মাজানকে জান্নাতের সুউচ্চ মোকাম দান করেন (আমীন)।

# সংবাদ

## তেজগাঁও- জামা'তে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা ও তবলিগী সভা অনুষ্ঠিত

গত ২২ মে, ২০১৫, রোজ শুক্রবার, বাদ জুমুআ স্থানীয় জামে মসজিদ 'আল মসজিদ বায়তুল ইসলাম'-এ মজলিস আনসারুল্লাহ, তেজগাঁও-এর উদ্যোগে এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেজগাঁও-এর সার্বিক সহযোগীতায় অনুষ্ঠিত হয় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা ও তবলিগী অনুষ্ঠান। জুমুআ নামায পড়ান মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মুবাল্লেগ ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর, বাংলাদেশ। জুমুআর নামাযে বেশ কিছু অআহমদী মেহমান অংশ নেন। জলসার কার্যক্রম শুরু হয় মোহতরম মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ, সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ-এর সভাপতিত্বে জনাব মাহমুদ আহমদ সুমন-এর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। এতে সুললিত কণ্ঠে উর্দূ নযম পাঠ করেন জনাব কাশেম হোসেন পিয়াস, ছাত্র, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ। সূচনা বক্তব্য রাখেন জনাব মাকসুদ উল হক, যয়ীম, তেজগাঁও। মূল বক্তৃতা পর্বে 'মানবতা প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ, সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ। তিনি তার বক্তৃতায় হযরত রসূল করীম (সা.) সমাজ ও বিশ্বে যেভাবে মানবতা প্রতিষ্ঠা করেছেন তার কিছু নমূনা এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। এরপর 'বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অতুলনীয় আদর্শ' এ বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মুবাল্লেগ ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর, বাংলাদেশ। তিনি তার বক্তৃতায় মহানবী (সা.)-এর ক্ষমা এবং দয়ার যে নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করেছেন তা তুলে ধরেন। মহানবী (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী তিনি এমনভাবে তুলে ধরেন যে, উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তা শোনেন এবং সবার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়। এরপর তবলিগী আলোচনাপর্ব শুরু হয়। আমাদের ধর্ম বিশ্বাস ও পরিচিতি তুলে ধরেন জনাব মাহমুদ আহমদ সুমন। উপস্থিত মেহমানদের পক্ষ থেকে অনেকেই প্রশ্ন করেন। সকল প্রশ্নের উত্তর মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মুবাল্লেগ ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর, বাংলাদেশ কুরআন হাদীসের আলোকে প্রদান করেন। দোয়ার মাধ্যমে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা ও তবলিগী সভার সমাপ্তি ঘটে। উক্ত জলসায় ৫৫জন মেহমানসহ প্রায় ১৩০জন উপস্থিত ছিলেন।

*মাকসুদ উল হক*

# মিরপুরে সিরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ৯ মে ২০১৫ রোজ শনিবার, বাদ মাগরিব, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মিরপুরের উদ্যোগে সিরাতুন নবী (সা.) শীর্ষক আলোচনা ও প্রশ্নত্তোর সভা অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে 'বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া জামা'ত' শীর্ষক একটি প্রামান্য চিত্র প্রদর্শণ করা হয়। যাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, মেম্বার অব পার্লামেন্ট, বিভিন্ন দেশের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট এর বক্তব্য শুনানো হয়। অতপর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে মূল আলোচনা সভা শুরু হয়। সভায় কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌ. হাফেজ আবুল খায়ের। দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম বি, আকরাম আহমদ খাঁন চৌধুরী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মিরপুর। নযম পাঠ করেন জনাব রাহুল আলী। বক্তব্য পর্বে 'হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন আদর্শের এক ঝলক' বিষয়ে জ্ঞানগর্ব বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান সুমন। তার বক্তব্যে হযরত রসূল করীম (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন, সেইসাথে প্রত্যেকের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে ইসলামের সুন্দর শিক্ষাগুলো তুলে ধরে তার আলোকে আমাদের করনীয় বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। অতপর 'হযরত রসূল করীম (সা.)-এর আবির্ভাব ও সময়কাল' বিষয়ে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ব বক্তব্য তুলে ধরেন মোহতরম মোহম্মদ হাবীব উল্লাহ, সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ। সদর সাহেবের বক্তব্যের পর অনুষ্ঠিত হয় প্রাণবন্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব। প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন মওলানা আব্দুল আইয়াল খাঁন চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর, বাংলাদেশ। প্রশ্নোত্তর পর্বে মেহমানগণ বিভিন্ন প্রশ্ন করেন এবং মওলানা সাহেব যথাযথভাবে সন্তোষ জনক জবাব প্রদান করেন।

জলসায় প্রায় ৫২ জন মেহমানসহ ২১০ অংশ গ্রহণ করেন। সর্বশেষে দোয়ার মাধ্যমে জলসা শেষ হয়।

***মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম মিল্টন***

# খুলনায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপিত

গত ০৪/০৪/২০১৫ তারিখ শনিবার সকাল ৯.৪৫ ঘটিকায় মোহতরম মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর সভাপতিত্বে বায়তুর রহমান মসজিদ কমপ্লেক্সে মহান সীরাতুন নবী (সা.) জলসার প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়। অধিবেশনের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান তুষার। অতঃপর উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। এরপর আরবি কাসিদা পরিবেশন করেন জনাব মনিবুর রহমান আসিফ ও তার দল। বক্তৃতা পর্বে মওলানা মুহাম্মদ খুরশীদ আলম 'মানবতার প্রতি মুহাম্মদ (সা.) এর অনুগ্রহ' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এরপর মওলানা মুহাম্মদ সোলায়মান 'হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর রসূল (সা.) প্রেম' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এরপর নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মুবাল্লেগ ইনচার্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। বিকাল ৩.৩০ মিনিটে ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ এর সভাপতিত্বে সীরাতুন নবী জলসার সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয়। অধিবেশনের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ মফিজুর রহমান। বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব তানভীর আহমদ শোভন। এরপর পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা প্রদান করেন মওলানা মুহাম্মদ সোলায়মান, জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, খুলনা এবং মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

অতঃপর সভার সভাপতি সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন এবং দোয়ার মাধ্যমে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। শেষে তিনজন বয়আত গ্রহণ করেন। বয়আত অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। এরপর প্রশ্নোত্তর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন উপস্থাপন করেন এবং উত্তর প্রদান করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। উক্ত জলসায় ২২৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

***এন, এ শাহীন***

# নারায়ণগঞ্জ জামা'তে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপিত

গত ১৭/০৪/২০১৫ তারিখ বাদ জুমুআ মজলিস আনসারুল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ-এর উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফেজ মোহাম্মদ মজিবুর রহমান, উর্দু নযম পেশ করেন চৌধুরী আতিকুল ইসলাম। এতে সূচনা বক্তব্য রাখেন মোহতরম মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ। এরপর শান্তি প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর জীবনাদর্শ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হয়, মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। পরিশেষে স্থানীয় আমীর জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা পাঠোয়ারী দোয়া পরিচালনা করে জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত সীরাতুন নবী জলসায় ৬২ জন মেহমান সহ মোট ২৩৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

*ডাঃ মোজাফ্‌ফর উদ্দিন আহমদ*

# তেজগাঁও লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ০৮/০৫/২০১৫ তারিখ তেজগাঁও লাজনা ইমাইল্লাহর উদ্যোগে স্থানীয় জামে মসজিদে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। জলসার কার্যক্রমের শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ফারহানা মাহমুদ তন্বী। নযম পাঠ করেন তানজিলা সিদ্দিকা, মলফুযাত পাঠ করেন সৈয়দা কামারুন্নেছা মমি। বক্তৃতা পর্বে প্রিয় নবী (সা.)-এর অতুলনীয় আদর্শ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আরিফা রহমান, ইসলামে নারীর মর্যাদা এবং মহানবী (সা.)-এর আদর্শ এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ফারহানা মাহমুদ তন্বী। এ পর্যায়ে আরবী কাসিদা পাঠ করেন ফাহমিদা হোসেন জেনী ও ফারিয়া হোসেন আভা। পর্দার আড়াল থেকে 'ক্ষমা ও মানবতা প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.)' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মৌ. মাহমুদ আহমদ সুমন। মহামূল্যবান ৪০ টি হাদীস পাঠ করে শোনান আতিয়াতুল ওয়াহীদ। জলসায় পর্যায়ক্রমে নযম পাঠ করেন শারমিন আক্তার (শিখা), নাফিছা মালিয়াত তাবিয়া ও তার দল, ভিকারুন্নেছা লুনা এবং মুনাজ্জাতুল লাবিবা ও তার দল। সবশেষে শুকরিয়া জ্ঞাপন ও দোয়া পরিচালনা করেন তেজগাঁও লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট শারমিন আক্তার (শিখা)। অনুষ্ঠানে সব মিলে প্রায় ৩২ জন উপস্থিত ছিলেন।

*শারমিন আক্তার*

# মজলিস আনসারুল্লাহ রাজশাহী রিজিওনের কর্মশালা ও দূর্গাপুরের দেবীপুরে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্ তা'লার ফজলে গত ১০ এপ্রিল, ২০১৫ শুক্রবার মজলিস আনসারুল্লাহ রাজশাহী রিজিওনের কর্মশালা সকাল ১০ঃ০০ ঘটিকায় রাজশাহী রিজিওনের কর্মশালা পবিত্র কুরআন পাঠের মাধ্যমে শুরু হয়। কর্মশালায় আনসারুল্লাহর ৩৭তম মজলিস শূরায় গৃহীত শুপারিশমালা যা হুযূর (আই.) কর্তৃক অনুমোদন করেছেন তা বাস্তবায়ন করার পদ্ধতি, সমস্যা সমাধান, বাস্তবায়নে কেন্দ্রকে অবহিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। দুপুর ১২ঃ৩০ পর্যন্ত কর্মশালার কর্মসূচী চলতে থাকে। রাজশাহী রিজিওনের ১৬টি মজলিসের মধ্যে ১১টি মজলিস এ কর্মশালায় যোগদান করে। কর্মশালায় জনাব মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, নায়েব সদর আউয়াল, জনাব আবদুস সামী, আনসারুল্লাহর প্রতিনিধি, জনাব ইনসান আলী ফকির, কায়েদ তালিমুল কুরআন এবং রাজশাহী রিজিওনের রিজিওনাল নাযেম জনাব আব্দুল খালেক মোল্লাহ, রাজশাহী জেলা নাযেম জনাব তারেক চৌধুরী এবং পাবনা বগুড়ার জেলা নাযেম জনাব মোহসীন আলী যোগদান করেন।

১১ এপ্রিল, ২০১৫ শনিবার বাদ মাগরিব পূর্ব কর্মসূচী অনুযায়ী বাগমারা সৈয়দপুর জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব সাইফুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে সীরাতুন নবী (সা.) জলসার কার্যক্রম পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। 'হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নির্দেশে বয়আত' করার গুরুত্ব সম্পর্কে হালকা প্রেসিডেন্ট জনাব কলিমউদ্দিন বক্তব্য রাখেন, 'বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর' ওপর বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ আবদুল জলিল, 'উত্তম দায়ী ইলাল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা.)' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা সালাহউদ্দিন আহমদ এবং সবশেষে 'হযরত মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর দৃষ্টিতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)' এ বিষয়ে সভাপতি জনাব সাইফুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন। বক্তৃতা পর্বের শেষে প্রশ্নোত্তর পর্ব হয়। দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়। জলসায় ৩৫ জন আহমদী এবং ৮০ জন (পুরুষ মহিলাসহ) অ-আহমদী মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

*মোহাম্মদ আবদুল জলিল*

# মসীহ মাওউদ (আ.) দিবস পালিত

## ব্রাহ্মণবাড়িয়া

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া কর্তৃক ২৩ মার্চ বাদ মাগরিব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত মহতী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সোলেমান আহমদ, নযম উর্দু ও বাংলা যথাক্রমে পাঠ করেন কাওসার আহমদ, মঞ্জুর ও নুরুদ্দীন আহমদ। অনুষ্ঠানে বয়আতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সান ও মর্যাদাসহ বিভিন্ন বিষয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন মৌ. আবু তাহের, মওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম, জনাব এখতিয়ার উদ্দিন শুভ এবং জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার। সবশেষে সভাপতির জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত মহতী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ১৮৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

*মোস্তাক আহমদ খন্দকার*

## গাজীপুর

গত ২৭ মার্চ ২০১৫ তারিখ স্থানীয় জামা'তের উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও নযম পেশ করেন যথাক্রমে জনাব বি.কে চৌধুরী এবং শেখ হাম্মাদ আহমদ। এরপর বক্তৃতা পর্বে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আগমন, সত্যতা, তাঁর রসূল প্রেমসহ বিভিন্ন বিষয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন ডা. জায়েদুল কাদের, জনাব কবীর আহমদ, মৌ. লুৎফর রহমান এবং জনাব হাবীবুর রহমান। দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়। এতে ৩৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

*মোহাম্মদ মহিবুর রহমান*

## শৈলমারী

গত ০৩/০৪/২০১৫ তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুআ শৈলমারী মসজিদে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন জনাব নূরুল ইসলাম, জেনারেল সেক্রেটারী। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব সাব্বির আহমদ, নযম পরিবেশন করেন জনাব তাহের আহমদ। এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস সম্পর্কে আলোচনা করেন মৌ. মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এতে ১৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

*মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম*

## রংপুর

গত ২৭/০৩/২০১৫ তারিখ স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে দিবসটি পালন করা হয়। দিবসের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে পাঠ ও নযম পাঠ করা হয়। দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সূচনা হয়। এতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জীবনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব তাহমিদুজ্জামান, রফিকুল ইসলাম রফি, সালাউদ্দিন বাবু, মাহবুব ইসলাম, মসিহ উজ্জামান, আমিরুল ইসলাম, খন্দকার মাহবুবুল ইসলাম ও মৌ. দাউদ আহমদ বুখারী। সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এতে ৩৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

**মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ**

## পটুয়াখালী

গত ১০ এপ্রিল বাদ জুমুআ পটুয়াখালীর উদ্যোগে মসজিদ নূরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন কর হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। এতে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা, তাঁকে মানার গুরুত্বসহ বিভিন্ন বিষয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা জনাব কাইয়ুম মিয়া এবং মওলানা নওশাদ আহমদ। সবশেষে সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এত ২১ জন উপস্থিত ছিলেন।

**নওশাদ আহমদ**

## কুঠির হাট

গত ২৪/০৪/২০১৫ তারিখ স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব শাহআলমের সভাপতিত্বে এবং জনাব মোহাম্মদ খালেদ ভূঞার পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে ইমাম মাহ্দী (আ.) এর বাল্যকাল, সাদাকাতে মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)কে মানার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন মৌ. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

*মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম*

## সিরাজগঞ্জ

গত ২৩ মার্চ ২০১৫ তারিখ রোজ সোমবার বাদ মাগরিব খোদ্দামুল আহমদীয়া সিরাজগঞ্জ এর উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় কায়েদ জনাব মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম খাঁন। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। এতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন সর্বজনাব সোহেল আহমদ, সুজন আহমদ, মাহবুব আলম, মোশতাক আহমদ। সবশেষে সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ১৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

*মোহাম্মদ মাহবুব আলম*

## লাজনা ইমাইল্লাহ্ রংপুর

গত ০৩/০৪/২০১৫ তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুআ রংপুরের উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত, দোয়া, হাদীস এবং নযমের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর উক্ত দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উল্লেখ করে পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা করেন রেজওয়ানা রশিদ, আনোয়ারা বেগম, দিলরুবা জামান, আমিনা নুসরাত এবং সুফিয়া বেগম। উক্ত অনুষ্ঠানে ১৫ জন উপস্থিত ছিলেন। *দিলরুবা জামান*

# ফুলবাড়ীয়া মজলিস প্রতিষ্ঠা

গত ০৮ই মে ২০১৫ইং তারিখে রোজ শুক্রবার এক জাঁকজমক পূর্ণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে ময়মনসিংহ মজলিসের ফুলবাড়ীয়া হালকাকে মজলিস হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এতে কেন্দ্র হতে মোহতরম সদর সাহেবের প্রতিনিধিবর্গসহ রিজিওনাল কায়েদ ময়মনসিংহ রিজিওন, জেলা কায়েদ ময়মনসিংহ জেলা, ময়মনসিংহ ও ধানীখোলা মজলিসের স্থানীয় কায়েদ সাহেবান উপস্থিত ছিলেন। বাদ জুমুআ ন্যাশনাল মোতামাদ জনাব জাহেদ আলীর সভাপতিত্বে কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এর পর পর্যায়ক্রমে রিজিওনাল কায়েদ, জেলা কায়েদ, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট ও জামা'তের সেক্রেটারী মাল, স্থানীয় কায়েদ এবং মোহতামীম তাজনীদ বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তারা দিনটিকে ফুলবাড়ীয়া মজলিস তথা জামা'তের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন বলে উল্লেখ করেন। এখানে ২০০৮ সালে জামা'ত প্রতিষ্ঠার পর ২০১১ সালে মজলিস আনসারুল্লাহ এবং ৮মে ২০১৫ খোদ্দামুল আহমদীয়ার মজলিস প্রতিষ্ঠা হয়। সবশেষে সভাপতি তার বক্তব্যে মোহতরম সদর মজলিসের পক্ষে ফুলবাড়ীয়াকে মজলিস হিসাবে ঘোষণা প্রদান করেন। এরপর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার নবনিযুক্ত কায়েদ জনাব আবুল হোসেন-কে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হয়। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এতে খোদ্দাম, আতফাল ও আনসারসহ ২৩ জন উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, ফুলবাড়ীয়া উপজেলার সকল আহমদী খাদেম ও তিফলগণ এই মজলিসের সদস্য হবেন। জামা'তের সকলের কাছে ফুলবাড়ীয়া মজলিসের নবনিযুক্ত কায়েদ ও মজলিসের সকলের জন্য দোয়ার আবেদন করছি।

*মোহাম্মদ জাহেদ আলী*

# মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাতাপিতা দিবস পালিত

গত ২ মে ২০১৫ তারিখ রোজ শনিবার বাদ মাগরীব আহমদী পাড়াস্থ মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ-এ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে মাতাপিতা দিবস উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে বক্তব্য রাখেন মওলানা শামসুদ্দিন আহমদ এবং জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন, আমীর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বক্তাগণ কুরআন হাদীসের আলোকে পিতামাতার জন্য নেক সন্তান গঠনের গুরুত্ব ও করণীয় বিষয়ে বিশদ দিকনির্দেশনামূলক আলোচনা করেন, পাশাপাশি পিতামাতাদের প্রতি সন্তানদের দায়বদ্ধতা ও করণীয় এই বিষয়ে জ্ঞানপূর্ণ আলোচনা করেন। সভাপতির সমাপনী ভাষণের পর দোয়া পরিচালনা করেন আমীর সাহেব। এই সম্মেলনে ১৯৫ পিতামাতাসহ মোট ২৫১ জন উপস্থিত ছিলেন।

*আফছার মোল্লা*

# লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জের উদ্যোগে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জের উদ্যোগে গত ১০-০৪-২০১৫ তরিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সম্মেলন ২০১৫ সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন পাঠ ও সদর লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ-এর দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র পরিচিতি উপস্থাপন করেন মাসুদা পারভেজ। শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলাম ধর্মের ভূমিকার ওপর বক্তব্য রাখেন সেলিনা তবশির।

আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সম্মেলনের উদ্দেশ্য এর ওপর বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন উজমা চৌধুরী। বিভিন্ন ধর্মীয় সদস্যবৃন্দের উপস্থিতিতে উক্ত সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠায় ধর্মের ভূমিকা। বৌদ্ধ ধর্মের মহিলা নেত্রী উর্মিলা বড়ুয়া সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনের পূর্বে নব নির্মত লাজনাদের জন্য মসজিদের তৃতীয় তলায় নামাযের জায়গা শুভ উদ্বোধন করেন রওশন জাহান, সদর, লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ।

দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সম্মেলনে ৮৩ জন লাজনা, ৪৮ নাসেরাত ও বিভিন্ন ধর্মের সদস্যবৃন্দ ও জেরে তবলীগ ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

*উম্মে কুলসুম চায়না*

# আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

## (এমটিএ-তে সম্প্রচারিত)

## হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারমর্ম

**নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত শুক্রবার (২২ মে, ২০১৫) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।**

হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "হে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা বারবার সন্দেহ করা থেকে বিরত থাকো, কেননা কোন কোন সন্দেহ অবশ্যই পাপ।"

হুযূর (আই.) বলেন, মানুষের হৃদয়ে কি আছে তা খোদা ছাড়া কেউ জানে না, তাই কারো ব্যাপারে কুধারণা বা সন্দেহ করতে তাড়াহুড়ো কোরো না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে জামাতের ভেতর থেকে অনেক আপত্তি ও অনুযোগ করা হয়েছে, আজও বিভিন্ন সময় জামা'তের কার্যক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে আপত্তি করা হয় কিন্তু হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-কে মুরতাদ ও মুনাফিকদের পক্ষ থেকে অনেক বেশি আপত্তি ও অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

সত্য জামা'তের জন্য এটি কোন নতুন বিষয় নয়, অতীতের নবীদের এবং তাঁদের অনুসারীদের বিরুদ্ধেও অনেক আপত্তি করা হয়েছে। কিন্তু খোদা তা'লা তাঁর ব্যবহারিক স্বাক্ষ্য দ্বারা এসব আপত্তির খন্ডন করেছেন এবং স্বীয় সাহায্য ও সমর্থন দ্বারা তাঁদেরকে প্রিয়জন বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

এরপর হুযূর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর ভাষায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যাপিত জীবনের বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরেন যদ্বারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সঙ্গে খোদার বিশেষ সাহায্য ও সমর্থনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তের প্রতি এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি কীরূপ ভালবাসা এবং খোদার প্রতি কতটা আস্থা ছিল এ সম্পর্কে তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাও হুযূর তুলে ধরেন।

তিনি (রা.) বলেন, একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর একটি স্বপ্নের কথা আমাকে বলেছেন যে, তাঁকে একটি কবরের স্থান দেখানো হয় যা রৌপ্য দ্বারা নির্মিত আর একজন ফিরিশ্‌তা বলেন, এগুলো তোমার ও তোমার পরিবার পরিজনের কবর। এরপর তাঁর নির্দেশে তাঁর পরিবারের সদস্যদের ওসীয়্যত ছাড়াই বেহেশতী মকবেরায় সমাহিত করার ব্যবস্থা করা হয়। তিনি (রা.) বলেন, প্রশ্ন হলো, যারা আপত্তি করে যে, আমরা নাকী আঞ্জুমানের অর্থ আত্মসাৎ করছি তারা কি বিষয়টি একবার ভেবে দেখেনা? যদি আমরা জামা'তের লোকদের দেয়া অর্থ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করতাম তাহলে বেহেশতী মকবেরায় কেন খোদা আমাদের সমাহিত করার সংবাদ দিলেন।

তিনি (রা.) আরো বলেন, যারা খোদার রাস্তায় অর্থ দিয়ে বলে বেড়ায় যে, তা যথাযথভাবে ব্যয় করা হয়নি, তাদের এরূপ কথা শুনে আমার পরিতাপ হয়। আমি এবং আমার পরিবার খোদার রাস্তায় যা দেই বা দিচ্ছি তা বলতে আমি লজ্জাবোধ করি কিন্তু আমি ও আমার পরিবার যা দেই তা পুরো জামা'ত যা দেয় তার চেয়েও বেশি। এমনকি তিনি (রা.) দারিদ্রতার যুগেও পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি করে পবিত্র কুরআনের প্রথম অনুবাদ ছাপানোর ব্যবস্থা করেছিলেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের শেষ জলসায় মোট উপস্থিতি ছিল ৭০০জন। এটি দেখে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আনন্দে উদ্বেলিত হন এবং বলেন, এখন আমাদের জামা'ত অনেক বড় হয়ে গেছে, এ জামা'তকে কেউ আর ধ্বংস করতে পারবে না। পাশপাশি অতিথির সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণে তিনি কিছুটা চিন্তিতও হন যে, কীভাবে অতিথিসেবা হবে। কিন্তু তাঁর প্রভু, যিনি তাঁকে এ যুগে মানুষের সংশোধনের জন্য পাঠিয়েছেন তিনি স্বয়ং অদৃশ্য হতে ব্যবস্থা করে তাঁর সকল দুঃশ্চিন্তা দূর করেছেন।

হুযূর বলেন, আজ জামা'ত কত বড় হয়ে গেছে। বিশ্বের সকল দেশে আমাদের মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজ কাউকে যদি অতিথিশালার একদিনের ব্যয় বহনের জন্য বলা হয় তাহলে তিনি হয়তো পুরো বছরের ব্যয়-ই বহন করতে চাইবেন। আজ একেক জন এত মোটা অংকের চাঁদা দেয় যে, তা পূর্বে হয়তো এক বছর বা দু'বছরেও গোটা জামা'ত দিতে পারতো না। কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখুন! হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগের সেই একটি দিন আর ফিরে আসবে কী? হুযূর বলেন, একথা ঠিক যে, সে যুগ আর দেখা সম্ভব নয় তথাপি তাঁর দোয়ার উত্তরাধিকারী আমরা হতে পারি যদি আমরা নিজেদের মাঝে সেই আবেগ সৃষ্টি করি। যদি সেই পবিত্র পরিবর্তন নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করি যা তিনি তাঁর সাহাবীদের মাঝে সৃষ্টি করে গেছেন।

হুযূর বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর তিরোধানের পর তাঁর শিরধারে দাঁড়িয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) একটি অঙ্গীকার করেছিলেন যখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৯বছর। তিনি বলেন, "হে খোদা! আমি তোমার মসীহ্‌র শবদেহের সামনে দাঁড়িয়ে অঙ্গীকার করছি। হে আল্লাহ্! যদি একজনও এই জামা'তে না থাকে তবুও আমি তোমার মসীহ্‌র এই মিশনকে সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করবো।" তিনি (রা.) তাঁর জীবন দিয়ে এই অঙ্গীকার রক্ষা করে গেছেন। তিনি তাঁর গোটা জীবন এই জামা'তের জন্য উৎসর্গ করেছেন এবং বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বার্তা পৌঁছে দিয়ে গেছেন, যার সুফল আজ আমরা ভোগ করছি।

হুযূর বলেন, আজ আমাদের জামা'তের প্রত্যেক সদস্যের এই অঙ্গীকার নবায়ন করা উচিত যাতে আমরাও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই পবিত্র মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। আর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও কৃপা ছাড়া একাজ সম্ভব নয়। আল্লাহ্ আমাদের প্রতি কৃপা করুন এবং সকল আহমদীকে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের সৌভাগ্য দান করুন।

# জামা'তে আহমদীয়া অস্ট্রিয়ার উদ্যোগে দ্বিতীয় শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ১০ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় শান্তি সম্মেলন অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্‌। পবিত্র কুরআন পাঠের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সমাজের সকল শ্রেণী ও পেশার লোকদের পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মের নেতৃবৃন্দকেও বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এদের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, ইউনিফিকিশনস চার্চ এবং Universal Peace Federation এর প্রতিনিধিবৃন্দ এ মহতি অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং নিজেদের মতামত ব্যক্ত করে বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর একটি প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করা হয়।

একটি প্রশ্নের উত্তরে অস্ট্রিয়া জামা'তের মুরব্বী মওলানা মুনির আহমদ মনোয়ার সাহেব সম্মানিত সুধিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম এবং শান্তি ও সৌহার্দ্যের শিক্ষা প্রদান করে। আজ ইসলামের নামে প্রদর্শিত সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সঙ্গে ইসলামী শিক্ষার দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম বিদ্বেষী একজন নারী যিনি ইসলাম সম্পর্কে অনেক আপত্তি করছিলেন দীর্ঘক্ষণ প্রশ্নোত্তর শোনার পর তিনি আশ্বস্ত হন। অবশেষে তিনি বলেন, আহমদীয়া জামা'তের এগিয়ে আসা উচিত এবং ইসলামের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেয়া উচিত। কেননা, সত্যিকার ইসলাম তাই যা আহমদীয়া জামা'ত তুলে ধরছে। এসময় ইংরেজি, জার্মান,আরবী এবং টার্কিশ ভাষায় অনুদিত পবিত্র কুরআন এবং আহমদীয়া জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সম্মানিত অতিথিদের অনেকেই আগ্রহভরে এসব বই-পুস্তক সংগ্রহ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জাতির ১৩৮জন অস্ট্রিয়ান এবং ২০জন আহমদী উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেছে।

# নেপালে দুর্যোগ সহায়তায় হিউম্যানিটি ফার্স্টের কার্যক্রম

নেপালে দুর্যোগ সহায়তায় গঠিত হিউম্যানিটি ফার্স্টের স্বেচ্ছাসেবী দলটি কিছুদিন পূর্বে দায়িত্ব পালন শেষে যুক্তরাজ্যে ফিরে আসেন এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ আল্‌ খামেস (আই.)-এর কাছ থেকে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করেন।

নেপালে অবস্থিত গোরখা জেলায় প্রায় দু'সপ্তাহ ব্যাপী ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার পর সার্জন্স, ফিজিশিয়ানস এবং প্যারাম্যাডিক্স সহ ১২ সদস্যের চিকিৎসক দলটি কাঠমুন্ডু থেকে যুক্তরাজ্যে পৌঁছেছে।

নেপালে মর্মান্তিক ভূমিকম্পের পর ১২ সদস্যের এ দলটি দুঃস্থদের মাঝে বিভিন্ন চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দিবানিশি নিরলস ও কঠোর পরিশ্রম করে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নেপালের সহায়তা নিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ভারত এর সমন্বয়ে গঠিত এ দলটির ওপর গোরখা জেলার আশেপাশে অবস্থিত ভূমিকম্প কবলিত অঞ্চলগুলোতে দুঃস্থদের সেবা প্রদানের দায়িত্ব বর্তায়। এ সময় বাটাসে এবং তিনমানে গ্রামে আহত প্রায় ১০০০ অসহায় মানুষকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ আল্‌ খামেস (আই.)-এর নির্দেশে প্রথম দলটি পাঠানো হয় বিভীষিকাময় ভূমিকম্পের পরপরই। যুক্তরাজ্যে ফিরে আসার পর ১২ সদস্যের দলটি হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সাথে সাক্ষাত করেন এবং রিপোর্ট পেশ করেন। এ সময় তিনি দলটির দু'সপ্তাহ ব্যাপী ত্রাণ ও চিকিৎসা কার্যক্রম সহ তাদের যেসব বাঁধা ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, সে সম্পর্কে অবহিত হন।

হুযূর (আই.) পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন এবং নির্দেশ দেন যাতে মানবতার সেবায় এ মহতী কাজ অব্যাহত থাকে।

এ উদ্দ্যেশে ইতিমধ্যেই কয়েকজনের সমন্বয়ে একটি দ্বিতীয় দলটি নেপালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেছে যাতে করে ত্রাণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।

হিউম্যানিটি ফার্স্টের এই দলটি এখনও নেপালে অবস্থান করছে এবং তাদের ত্রাণ পুনর্বাসন কাজ অব্যাহত রেখেছে। যখন যেখানে প্রয়োজন হচ্ছে হিউম্যানিটি ফার্স্টের তাৎক্ষণিক সেবা পৌঁছে যাচেছ দুঃস্থদের কাছে, যাতে করে দুর্যোগ-কবলিতরা পুনরায় তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারে।

হিউম্যানিটি ফার্স্ট একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, যারা বিশ্বময় যে কোন দুর্যোগের সময় আন্তরিকতার সঙ্গে দুঃস্থদের সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়। ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানটি ক্রমাগত দুর্যোগ কবলিত মানুষের সহায়তা এবং আর্ত মানবতার খাতিরে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

# হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক তাহরীককৃত দোয়াসমূহ

গত কয়েক দশক ধরে আহমদীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষভাবে পাকিস্তানে নির্যাতিত হয়ে আসছে। অন্যান্য দেশে এ অবস্থার পরিবর্তন হলেও পাকিস্তানে দিন দিন এ অবস্থা কঠিন রূপ ধারণ করছে। আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ্‌র প্রতি বেশী বিনত হতে হয়। গত ৩০ মে ২০১৪ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) পুনরায় পুরো জামাতকে দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিম্নোল্লিখিত ১০টি দোয়া বেশী করে করার আহ্বান করেছেন।

১ সূরা ফাতিহা অধিক হারে পাঠ করা।

২ দরূদ শরীফ নিয়মিত পাঠ করা ।

৩ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরূদ সম্বলিত নীচের ইলহামী দোয়াটিও বেশী বেশী করা।

سُبۡحَانَ اللّٰہِ وَ بِحَمۡدِہٖ سُبۡحَانَ اللّٰہِ الۡعَظِیۡمِ
اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ

"সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদ"

অর্থঃ আল্লাহ্ অতীব পবিত্র এবং তিনি তাঁর সমস্ত প্রশংসাসহ বিরাজমান। আল্লাহ্ পবিত্র যিনি অতীব মহান। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

## পবিত্র কুরআনের দোয়া

৪

رَبَّنَاۤ اَفۡرِغۡ عَلَیۡنَا صَبۡرًا وَّ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَ انۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ

"রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন।" (সূরা বাকারা : ২৫১)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫

رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوۡبَنَا بَعۡدَ اِذۡ ھَدَیۡتَنَا وَ ھَبۡ لَنَا مِنۡ لَّدُنۡکَ رَحۡمَۃً ۚ اِنَّکَ اَنۡتَ الۡوَھَّابُ

"রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব।" (সূরা আলে ইমরান: ৯)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিয়ো না, আর তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে বিরাট রহমতের ভাগী কর, নিশ্চয় তুমিই সবচেয়ে বড় দাতা।

৬

رَبَّنَا اغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوۡبَنَا وَ اِسۡرَافَنَا فِیۡۤ اَمۡرِنَا وَ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَ انۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ

"রাব্বানাগ ফিরলানা যুনূবানা ওয়া ইসরাফানা ফি আমরিনা ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাউমিল কাফিরীন" (সূরা আলে ইমরান: ১৪৮)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের কাজ-কর্মে আমাদের বাড়া-বাড়ি ক্ষমা কর। আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

## হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দোয়া

৭

اَسۡتَغۡفِرُ اللّٰہَ رَبِّیۡ مِنۡ کُلِّ ذَنۡۢبٍ وَّ اَتُوۡبُ اِلَیۡہِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ: আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

৮

اَللّٰھُمَّ اِنَّا نَجۡعَلُکَ فِیۡ نُحُوۡرِھِمۡ وَ نَعُوۡذُبِکَ مِنۡ شُرُوۡرِھِمۡ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

## হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়া

৯

رَبِّ کُلُّ شَیۡءٍ خَادِمُکَ
رَبِّ فَاحۡفَظۡنِیۡ وَانۡصُرۡنِیۡ وَارۡحَمۡنِیۡ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্‌নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী ।

অর্থ: হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএবহে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

১০

یَارَبِّ فَاسۡمَعۡ دُعَائِیۡ وَمَزِّقۡ اَعۡدَاءَکَ وَاَعۡدَائِیۡ وَاَنۡجِزۡ وَعۡدَکَ وَانۡصُرۡ عَبۡدَکَ وَاَرِنَا اَیَّامَکَ وَ شَھِّرۡلَنَا حُسَامَکَ وَلَا تَذَرۡ مِنَ الۡکَافِرِیۡنَ شَرِیۡرًا

"ইয়া রাব্বি ফাসমা' দুয়ায়ী ওয়া মায্‌যিক আ'দায়াকা ওয়া'দায়ী ওয়ানজিয ওয়া'দাকা ওয়ানসুর আব্‌দাকা ওয়া আরিনা আইয়ামাকা ওয়া শাহহিরলানা হুসামাকা ওয়ালা তাযার মিনাল কাফিরীনা শারীরা ।"

অর্থ: হে আল্লাহ্! আমার মিনতি শোন। আর তোমার ও আমার শত্রুকে ধ্বংস করে দাও, আর তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, তোমার বান্দাকে সাহায্য কর আর তোমার নিদর্শন প্রকাশের দিন আমাদেরকে দেখাও। আর তোমার তীক্ষ্ণ তরবারির ঝলক আমাদেরকে দেখাও এবং অস্বীকারকারীদের মাঝ থেকে কোন বিদ্বেষীকে ছেড়ে দিয়ো না।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

**Md. Musleh Uddin**
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

## হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

**ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)**
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

**চেম্বার :**
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

**সিরিয়ালের জন্য:**
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

## AMECON
NIAZ METALLIC

**Meer Hasan Ali Niaz**
Founder

**Mobile: 01713001536, 01973001536**

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

| Jessore Office | Bogra Office | Chittagong Office |
|---|---|---|
| Palbari More, New Khairtola | Kanas Gari, Sherpur Road | 205, Baizid Bostami Road |
| Jessore. Tel : 67284 | Bogra. Tel : 73315 | Ctg. Tel : 682216 |

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 77 | 22th Issue

# The Ahmadi
Fortnightly

31st May, 2015 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

সেই ১৯৮৮ সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরাঁ

**ধানসিড়ি রেস্তোরা-১**
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

**ধানসিড়ি খাবার**
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রূপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"
মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta

# CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com